গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

কল্লোল

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮ - ২০১৯

কল্লোল

কল্লোল

গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ

কল্লোল
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

প্রকাশক:
ড. হরে কৃষ্ণ মণ্ডল
অধ্যক্ষ
গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ, গোবরডাঙা

যোগাযোগ:
খাঁটুরা, গোবরডাঙা, উত্তর ২৪ পরগনা
পশ্চিমবঙ্গ, পিন- 743273
ফোন: 03216-249210
ফ্যাক্স: 03216- 276374
ই-মেল: gobhinducollegeday@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.ghcollege.in

সম্পাদকমণ্ডলী: পারমিতা দত্ত এবং সুদেব বিশ্বাস

প্রচ্ছদ: তুষার সাহা ও সুমন সাহা

অক্ষর বিন্যাস: গেটওয়ে গ্রাফিক্স, প্রফুল্লনগর, হাবড়া।

মুদ্রণ: সাহা গ্রাফিক্স, বাণীপুর, হাবড়া।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়— ৫
সভাপতির বার্তা— ৭
Principal's Message—৮
শিক্ষক পরিষদের সম্পাদকের বার্তা—১০
অধ্যায়, যুথি সরকার —১৩
ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, রুনু প্রামানিক —১৩
পাগলিনী থেকে পরিণীতা, অয়ন্তিকা চক্রবর্তী —১৪
অপেক্ষা, স্বপন বিশ্বাস —১৪
নীরবতায় শান্তি, চয়ন সরকার —১৫
বন্ধু, অয়ন্তিকা চক্রবর্তী—১৫
বাবা, জাহিদ উদ্দিন গাজী —১৬
বাণী বন্দনা, নেহা দেব —১৭
নারী, রিথী রায় —১৭
ভালোবাসার ছন্দ, নারায়ণ দাস —১৮
অপরিচিতা, পিয়ালী দেবনাথ —১৮
মেয়েরা মা, সামিম মন্ডল —১৮
পণের বিরুদ্ধে পণ, শান্তনু সরকার —১৯
আলোকবর্ষ, সৈকত বিশ্বাস —১৯
বিদায় বেলার অনুভূতি, সঞ্চিতা দাস—২০
নারী দশভূজা, টিনা ঘোষ —২০
স্বপ্নের দিনগুলি, সুদীপা সাধু —২১
বেকারত্বের জ্বর, সুকন্যা ব্যানার্জী—২১
ইচ্ছে করে, দেবজৈতী ঘোষ—২২
দুঃসময়, জয়ন্ত মুখার্জী —২২
ব্যথা, অপর্ণা চক্রবর্তী —২৩
বেকারত্ব, সহদেব দাস—২৩
অতীশ দীপঙ্কর (জীবনী), শুভা চক্রবর্তী —২৪
পুরুষ, শামীমা আক্তার—২৫
"সারে জাহা সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা...", সাবিকুন নাহার—২৬
ক্ষণিকের স্মৃতিচারণ, দীপা রায় —২৮
তৃতীয় সার্জারি, সামিন ইয়াসার—২৯
ঘরে ফেরা হলো না নিবেদিতার, বিশ্বজিৎ গাইন —৩১
বৃদ্ধাশ্রম, সান্ত্বনা মণ্ডল —৩২
উদ্বাস্তু, শ্রাবণী রায় —৩৩
ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, অর্পিতা দাস—৩৪
অঞ্জনপ্রিয়া , অর্পিতা দেবনাথ—৩৬
শুভবুদ্ধি সম্পন্না, পৌলোমী সেন —৩৭
যুদ্ধ, মিজানুর মন্ডল —৩৮
না-বলা কথা, লোকনাথ সাহা—৩৮
শুভ জন্মদিন, পিংকন বিশ্বাস—৩৮
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বলরাম দাস —৩৯
স্বপ্ন সত্যি, নয়ন সাহা —৩৯
কোজাগরী, জয়িতা সুর—৪০
কিন্ডেল এর সাথে এখন সকলে মিঙ্গেল,
স্নিগ্ধা চক্রবর্তী—৪১
বিষয়: কল্পবিজ্ঞান, শমীক ঘোষাল —৪১
'আমিই আমার গল্পের নায়িকা', অঙ্কিতা সাহা— ৪৩
আত্মহত্যার সুপারি, জয়ন্ত মুখার্জী —৪৫
বিষয়-অ্যালবাম, অনিন্দিতা রায়—৫০
রবীন্দ্র ভাবনায় সত্য, শিব ও সুন্দর, ঊষাপ্রসন্ন মন্ডল —৫১
এক বেগম আম্মার করুণ কাহিনি: লুৎফুন্নিসা,
অধ্যাপিকা লিপিকা ঘোষ রায় —৫২
স্বপ্ননীড়, সুদেব বিশ্বাস —৫৪
You and I, পারমিতা দত্ত— ৫৫

‘কল্লোল’ পত্রিকার উপ-কমিটি
গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ

১) ড. লিপিকা বিশ্বাস
২) অধ্যাপক নৃপেন বিশ্বাস
৩) ড. উৎপল কুমার মণ্ডল
৪) অধ্যাপক প্রবীণ সিকদার
৫) অধ্যাপিকা সঙ্গীতা রায়
৬) অধ্যাপিকা পারমিতা দত্ত (আহ্বায়ক)
৭) অধ্যাপক বিশ্বজিৎ সাহা
৮) ড. স্মৃতি সরকার
৯) ড. ব্রজগোপাল চাদ
১০) অধ্যাপক দিনা দাস
১১) অধ্যাপক সুদেব বিশ্বাস
১২) অধ্যাপক নিলয় সরকার
১৩) অধ্যাপক কৃষ্ণকান্ত ঢালি

সম্পাদকীয়

সম্পাদকমণ্ডলী

পারমিতা দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ

সুদেব বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

'It may be on that joyless feast
his eye
Dwelt with mere outward
seeming; he, within,
Took measure of his soul, and
knew its strength,
And by that silent knowledge,
day by day
was calmed, ennobled,
Comforted, sustained.'
(*Matthew Arnold, "Mycerinns" lines 107-111*)

পরিবর্তন আর বিবর্তনের সময় সরণিতে দাঁড়িয়ে উত্তর-আধুনিক জীবন। কর্মব্যস্ততা আর স্বপ্ন খোঁজার লক্ষ্যে তীব্র ধাবমান সত্তা। স্বার্থ আর সংকীর্ণতার বেড়াজাল ছিন্ন মানব মন অভিসার করে কল্পনার জগতে। অনন্ত ভাবরাজি আঁচড় কাটে সৃষ্টিশীল সত্তায়। ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে থাকে সাহিত্যবীজ। আবহমান কালের এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রবাহিত হয় সময়ের স্রোতে। আর সেই সাহিত্য স্রোতের আরেক নাম 'কল্লোল'। গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক এই পত্রিকায় ছাপ পড়ে মননশীলতার।

প্রায় সারা বছর ধরেই চলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যাশা পূরণের দৌড়। সিলেবাসকেন্দ্রিক পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকে মন। ব্যস্ত আর রুটিনমাফিক জীবনে 'কল্লোল'— এক বসন্ত সমীরণ, মুক্তধারা। সৃষ্টি স্নাত নবীন হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় রংবাহারী ফুল। সাংস্কৃতিক আবহমণ্ডল দূরকে নিকটে আনে। ক্লাসরুমের পড়াশোনার বাইরেও 'কল্লোল' সৃষ্টি

প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী সকলে পারস্পরিক নৈকট্য অনুভব করে। সম্পর্কের মাধুর্য বৃদ্ধি পায়।

সময়ের অন্তর্জালে বন্দি সমগ্র বিশ্ব। সমাজ মাধ্যমে আত্ম-প্রচার কেন্দ্রিক বিজ্ঞাপনের ভিড়। জীবনের কৃত্রিমতা বর্জন করে কল্লোল খোঁজে আত্মনিমগ্ন সৃষ্টিশীল সত্তাকে। নতুন প্রজন্মের সাহিত্যপ্রেমী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বরচিত সাহিত্যসৃষ্টি ও প্রকাশের একটি দারুণ প্ল্যাটফর্ম। এছাড়া সর্বস্তরের সহৃদয় পাঠকদের মনের খোরাক মেটানোর দিকেও সচেতন এই সাংস্কৃতিক পত্রিকা। Ultra Modern যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাহিত্যের স্বরূপ, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, Photo Journalism বা Poster Presentation প্রভৃতি বিষয়ের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে 'কল্লোল' তার অনুসন্ধানে রত।

সাহিত্যিকের কলম হয়ে উঠুক যুগসচেতন, রুচিশীল ও উন্নত মানের। 'কল্লোল' হোক তার প্রতিচ্ছবি। সম্পাদকমণ্ডলীর সর্বদা এই প্রচেষ্টা। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতা নয়; একতা, সম্প্রীতি ও রুচিশীল সুস্থ মানসিকতার বার্তা দেয় 'কল্লোল'। ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলের সর্বাঙ্গীন বিকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

সুচেতনা দূরতর দ্বীপ হলেও ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটবে। এই আশায় 'কল্লোলে'র সৃষ্টি প্রয়াসে সকল ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সমবেত প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই এবং একই সঙ্গে পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে—

পারমিতা দত্ত
সহকারী অধ্যাপিকা
ইংরেজি বিভাগ

সুদেব বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

সভাপতির বার্তা

সুভাষ দত্ত
সভাপতি
পরিচালন সমিতি
গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ

ষাটের দশকে ছাত্রজীবন থেকে বর্তমান সময়ে পরিচালন সমিতির সভাপতিত্ব—এই দীর্ঘ সময়ে যে আনন্দ উৎস একই রয়েছে তা হল সাংস্কৃতিক যোগ। গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যের উত্তরসূরী কলেজ পত্রিকা 'কল্লোল'। এখানে প্রতিবছর প্রকাশ পায় নব্য থেকে প্রাচীন বহু কলমের বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি। যার পাঠ আনন্দ দেয়। স্মৃতিমেদুর করে। আশা জাগায়। আমিও এই অনুভূতির সমান অংশীদার। 'কল্লোল' পত্রিকায় এভাবেই সুরুচি ও মননের বিকাশ ঘটুক। নব চিন্তার অঙ্কুরোদগম হোক—

শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ সহ—
আপনাদের
'সুভাষ দা'

Principal's Message

Dr. Hare Krishna Mandal
Principal
Gobardanga Hindu College

Just a year to go and this new millennium shall mature more "perfectly" as one may say. Twenty years shall make this millennium come of age and perhaps pose new challenges for the world's inhabitants. Here, at our institution, too, we aim to reach out to a wider, greater realm. Classroom education is, among other things, looking forward to answer to more different roles both for teachers and students. Digitization will ensure that education and learning facilities may be availed by those who fail to make it to a "real" classroom. This offers new challenges. Distance education programmes have long tried to support the mainstream forms of education in numerous ways. Our institution, too, has already taken a step forward in this aspect. The Distance Education Centre of NSOU has been part of our campus for more than a decade. Certain noteworthy changes have continued to affect general education at most of the undergraduate and postgraduate programmes with the introduction of the newly introduced CBCS Curriculum. While the new system makes things appear different than what it used to be, it "imposes" certain strict "disciplines" in its manner of execution. Thus, a teacher may have to complete a part of the syllabus allotted to him/her keeping in mind the time constraint that lurks behind. So, the teacher's passions for dwelling on a particular aspect of study needs to be restricted, more controlled and well-planned in advance. Students, too, need to perform on a regular basis.

Internal assessments, viva-voce, end semester examinations, and attendance records are separately evaluated and marked. This adds to a more precise form of evaluation in which additional hours are spent by individual departments. Secondly, it provokes students to adjust to a more fast and effective method of learning. They are expected to cope more rapidly with these changes and adjust to the changes on a regular basis. It however, brings them closer to campus life and to their own teachers. Attendance records at our institution have increased to a considerable extent. Moving way onward to less conventional syllabi, the SEC subjects determine that the students may seek hands- on training and apply it to their own prospects in future.

I have tried to ensure better access to teaching-learning resources for all. Digitization of library books are under way. The library too needs to change for obvious reasons and the seeming grimness occupying the library space may soon be replaced with a more amiable ambience. I personally try to include all guardians in this institution too by requesting their kind presence at parent-teacher meetings. They often address issues that may help the institution to receive a better impetus for aiming towards excellence. Assuring all stakeholders of my constant support and unfailing determination to provide best resources.

Thanking You,
Dr. Hare Krishna Mandal

শিক্ষক পরিষদের সম্পাদকের বার্তা

কৃষ্ণকান্ত ঢালী
সহকারী অধ্যাপক
গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ

গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা ‘কল্লোল’ মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ আর আগ্রহে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ইন্টারনেট সর্বস্ব ব্যস্ত জীবনে সাহিত্যের আসরে দু’দণ্ড জিরিয়ে নেওয়া— এক আনন্দপূর্ণ অনুভূতি। নবীন-প্রবীণের সৃষ্টিশীল প্রতিভার মেলবন্ধন ‘কল্লোল’কে সমৃদ্ধ করেছে। সাহিত্যিক কলমে ফুটে উঠেছে মননশীলতার। সর্বস্তরের পাঠক চিত্তকে হয়তো রসসিক্ত করতে পারবে। ‘কল্লোলে’র সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রয়াস ও পরিশ্রমকে সাধুবাদ জানাই। ‘কল্লোলে’র আনন্দধারা প্রবাহিত হোক দিকে দিকে। পরবর্তী সংখ্যাগুলি আরও উন্নত এবং আরও সৃজনশীল ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে ও পাঠকের মনোগ্রাহী হওয়ার পথকে সুগম করবে, এই কামনায় ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কৃষ্ণকান্ত ঢালী
সহকারী অধ্যাপক
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'কল্লোল'— একটি সমবেত প্রয়াস ও প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। পত্রিকার উপকমিটির সদস্যবৃন্দ এবং তৎসহ কলেজের সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষা কর্মীবৃন্দ, যাদের সক্রিয় সহযোগিতায় কল্লোলের প্রকাশ সুষ্ঠ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে তাদের প্রতি রইল অফুরান কৃতজ্ঞতা ও কুর্নিশ। ভবিষ্যতেও এই সমবেত প্রচেষ্টায় নিঃস্বার্থ প্রত্যয় এগিয়ে যাবে—এই আমাদের প্রার্থনা ও অঙ্গীকার।

এই অবসরে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইলো যাদের প্রতি, সেই বিশিষ্ট মানুষেরা হলেন— জয়িতা সুর, সহদেব দাস, ঊষাপ্রসন্ন মণ্ডল, লোকনাথ সাহা, নারায়ণ দাস, মৌমিতা দাস, আঁখি সাহা, পল্টু ঘোষ, নৃপেন বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ গাইন, অমৃতা দেবনাথ, রুদ্রাণী দাশগুপ্ত চৌধুরী এবং যুগল কিশোর দাস।

অধ্যায়

যুথি সরকার
৩য় সেমিষ্টার, বাংলা (সাম্মানিক)

১
এইতো কদিন আগেও ধারণা ছিল না
পিৎজা বার্গার ছাড়াও জীবন চলে,
সপ্তাহধিক কারেন্ট না থাকলে আক্ষরিক
অর্থে প্রদীপ মোমবাতির আলোয় ঘর
আলোকিত করা যায়, হোমওয়ার্ক করা যায়,
গাড়ি-ঘোড়া, বিমান জাহাজে না চড়লেও
জীবনের গতি থেমে থাকে না। অসুস্থ হওয়া
পরিবারটির প্রিয় মানুষগুলি পাশে না
থাকলেও তাদের জীবনের গতি থেমে যায়
না।

মানুষের লম্ফ-ঝম্প যেন সব বদলে গেছে,
একেবারে চরিত্রের বদল মশাই! শাক্ত
থেকে সোজা নিরামিষ বৈষ্ণব বানিয়ে
ছেড়েছে। মনুষ্য নামের গরিমাও যেন করুণ
কৃপাপ্রার্থী!

কবে বিশ্ব জুড়ে আমাদের প্রত্যেকের
জীবনেই এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে।
আপন মানুষগুলি আরো আপন হয়ে
উঠেছে। মানুষের ক্রিয়েটিভিটি বেড়েছে।
আরও সৃষ্টিশীল হয়েছে মানুষ। প্রতিদিন
সন্ধ্যায় ঠাকুমার কাছে আবার গল্প শুনবার
আবদারটা যেমন সত্য হয়েছে ঠিক তেমনি
নিজেদেরকে সংযম রাখবার মন্ত্রটাও জানা
হয়ে গেছে।

২
সব ধ্বংসের পরে সৃষ্টি অনিবার্য। নতুন
দিনগুলির সূর্য আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে
এ বিশ্বাসে আমরা বিশ্বাসী। শুধুমাত্র
পাড়ার এক কোণে থাকা দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জন্য
বারবার চোখে জল চলে আসে; এ সময়ে
দাঁড়িয়ে তাদের যে দেখবার কেউ নেই। তারা
খুবই অসহায়!
তবে আমরা জানি আবার সব ঠিক
হয়ে যাবে; নিজের মনে সেই সত্যকে শিখরে
রেখে, নিজেকে ভালোবেসে; নিজেদেরকে
ভালোবেসে মনে মনে সংকল্প করে যাওয়া—
একদিন ঝড় থেমে যাবে,
পৃথিবী আবার শান্ত হবে।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা

রুনু প্রামানিক
৩য় সেমিষ্টার, ইংরেজি (সাম্মানিক)

শান্তি ও সহিষ্ণুতায় আজ পড়ল কি ভাটার টান?
মানুষ কি আজ ভুলতে বসেছে লাজ-লজ্জা-মান-অভিমান?
মূর্খ করে ধর্ম নিয়ে হানা-হানি
কার ধর্ম শ্রেষ্ঠ?
এটা নিয়ে টানা-টানি।
আবার উঠছে প্রশ্ন-
প্রতিবাদীরা গেল কোথায়?
ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডিটাই বা ভাঙবে কে?
পাবলিক তো মূর্খ, অন্ধ
বোঝেই না যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ।
ধর্ম ভক্তির নামে তাই, ছুটে যায়—
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়।
নজরুলের কলমের আঁচড় আজ থমকে গেল বুঝি?
নিস্তব্ধতার মিছিলে আজ তার উত্তর খুঁজি।

পাগলিনী থেকে পরিণীতা

অয়ন্তিকা চক্রবর্তী
তৃতীয় সেমিষ্টার, ইংরেজি (সাম্মানিক)

সে বলতো স্বার্থপর।
তার চোখে ছিলাম অহংকারী এক মেয়ে
আত্মসম্মানকে ভেবেছিল তুচ্ছ,
আকাশের মেঘ দেখে মনে মনে তাকে আকৃতি দিতাম,

সে বলতো, 'সময় নষ্ট'।
বসন্তের বাতাস প্রাণ ছুঁয়েছিল
ঠিক তার মতো।

তারপর একদিন কি যে হলো,
সময়ের অতল গহনে হারালো সব-
আমার প্রাণ, আমার পাগলামি
সবকিছু!
আর ফিরল না কখনও।

আজ সত্যিই আমি এক
অহংকারী, অভিমানিনী, বাস্তববাদিনী।
বসন্তের মৃদু স্পর্শ
সে তো সত্যিই সময় নষ্ট
স্বার্থপরতা আজ আমার রক্তে বয়
সেই রক্ত আজ যদি
ফোয়ারার মত ছিটকে এসে
জলের রেখা টেনে বলে
আমার কথা-
এক পরিণীতার আত্মকথা,
মেনে নেবে কী সে!

অপেক্ষা

স্বপন বিশ্বাস
বি.এ. ইতিহাস, ৩য় বর্ষ

কেন এত অভিমান তোমার?
কিসের এত ক্রোধ?
কি এমন ক্ষতি হতো
যদি কথা বলো।
পাথরের মূর্তির মতন তুমি নির্বাক,
চুপচাপ বসে থাকো
মুখ বুজে সবই দেখো
রাত দিন সারাক্ষণ কেন তুমি মনে ভাসো।
পারলে ধরে রাখো যেন তুমি নাই আসো।
কথা যদি নাই বল কেন এত অভিমান
বিশ্বাস তবুও আছে রয়ে যাবে চিরকাল।
করোনার জামানায় সবকিছু বন্ধ
চালু আছে ফোন শুধু কথা বলা বন্ধ।
আমারও তো অভিমান হয় বারবার
ছবি দেখি কথা বলি
ধীরে ধীরে সবই ভুলে যাই।।

নীরবতায় শান্তি

চয়ন সরকার
৩য় সেমিষ্টার, শিক্ষাবিজ্ঞান (সাম্মানিক)

নীরবতায় শান্তি, নীরবতা দূর করে ক্লান্তি,
কথায় যে কী শক্তি, জানাব মনে আসলে ভক্তি
মিলবে কর্ম থেকে মুক্তি, নীরবতায় অসম্ভব শক্তি।

কথায় কথা বাড়ে, কাজে বাড়ে কাজ,
একসাথে বাড়ে দ্বেষ, আর অবিশ্বাস,
দূরত্বে সম্মান বাড়ে, মনের অনেক টান,
তবে নীরবতায় শান্ত মন, জীবনের মূল গান।

নীরবতার কী শক্তি প্রকৃতি থেকে বোঝা যায়,
চুপ করে থেকেও সে কত কিছু কয়।
কখনও বৃষ্টি, কখনও ঝড়, কখনও বা শান্ত হয়ে
তবু এই নীরবতায় অনেক আওয়াজ হয়
প্রকৃতি বেড়ে ওঠে, জীবন সবুজে ভরে যায়।

নীরবতার যে কী গুণ, কী যে তার মহিমা,
পুরো প্রকৃতি নীরব তবু তার কত গরিমা,
ভালোবাসা নীরবে হয় নীরবে তার প্রকাশ,
কত যে ঘটনা ঘটে, নীরব দেখো আকাশ,
রাতে আকাশ, তবু সে নীরব, নক্ষত্র, সূর্যে ভরা,
তবুও আকাশ নীরব, নীরবতায় শান্তি।

বন্ধু

অয়ন্তিকা চক্রবর্তী
তৃতীয় সেমিষ্টার, ইংরেজি (সাম্মানিক)

সহজ নয় পাওয়া এই শব্দের মানে,
বন্ধু।
তার জন্য, তাদের জন্য বাঁচা
সহজ নয়, বন্ধু।
খুনসুটি, আনন্দ, দুঃখ মিশ্রিত
এ এক আলাদা জগৎ।
সহজ নয় এর রং, এর প্রতিটি স্পন্দন।
বন্ধুত্বের নামে প্রতারণা
পেয়েছি, বন্ধু।
তবু কি বলতে পারি,
বন্ধু
আমি পাইনি,
নাহ
বন্ধু যে আছে এখানেই
মানুষের, প্রাণীতে, উদ্ভিদে।
শুধু খুঁজে নিতে হয় তাকে,
বন্ধু।

বাবা

জাহিদ উদ্দিন গাজী
৩য় সেমিষ্টার, বাংলা (সাম্মানিক)

।।এক।।

ছোটখাটো একটা চাকরি করি। গত মাসে বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি ধারদেনা করে; প্রায় ছয়-সাত লক্ষ টাকা খরচ করে। একটু আগে মেয়ের ফোন,

—বাবা কেমন আছো তুমি?

'হ্যাঁ, মা ভালো... তুই ভালো আছিস তো?' মেয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে উত্তর দিল,

—আছি বাবা... ভালো!

আমি জিজ্ঞেস করলাম -'এই ভাবে বলছিস কেন মা? বল আমাকে...' ফোনের ওপার থেকে কোন উত্তর পেলাম না। আমি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলাম— 'তোর শ্বশুর-রা খুশি হয়েছে তো? ওরা কিছু বলেছে?'

—শাশুড়ি বলেছেন, বিয়েতে যে আসবাবপত্র গুলো দিয়েছো ওগুলো নাকি নিম্নমানের!

তখন আমার চোখে জল টলমল করছে। আমি বললাম— 'আচ্ছা মা, তোর শাশুড়িকে বলিস পরে না হয় তাদের পছন্দ মতো কিনে দেবো।' ওপার থেকে মেয়ে বলে উঠলো—

—বাবা শোনো, তুমি আমাদের বাড়িতে পুজোর জামা কাপড় দেবে না?

'হ্যাঁ, দেবো তো, কেন?'

—তুমি কাপড় দিও না! ননদ বলেছে—কাপড় দিলে সবার পছন্দ হবে না; কাপড় না দিয়ে টাকা দিয়ে দিতে—ত্রিশ হাজার টাকা দিলে সবার নাকি হয়ে যাবে!

'আচ্ছা মা, তুই চিন্তা করিস না; আমি এখনো তো বেঁচে আছি'—আমার বুঝতে দেরী হলো না এতক্ষণে মেয়ের চোখের অনেক জল গড়িয়ে পড়েছে!!

—আচ্ছা বাবা, এখন রাখি...

'আচ্ছা মা, ভালো থাকিস!'

।। দুই।।

রাতে ছোট ছেলে বাড়ি ফিরে আমাকে বলছে...

—বাবা তুমি জেগে আছো?

'হ্যাঁ, বল কিছু বলবি?'

—হ্যাঁ, আমার একটা ল্যাপটপ কিনতে হবে; আমার টিউশনির কিছু টাকা আছে, তুমি পয়ত্রিশ হাজার টাকা দিলে হয়ে যাবে।

'আচ্ছা দেখছি, খেয়ে ঘুমিয়ে পড় বাবা'

—না বাবা, লেট হলে Exam দিতে পারব না!

এখানেই শেষ নয়... নিজের বাড়িতে পুজোর জামা কিনতে আরোও দশ-বারো হাজার টাকা লাগবে। আরো রয়েছে, মেয়ের বাড়ি দেওয়া বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন আয়োজন! এইসব চিন্তা করতে করতে না খেয়ে শুয়ে পড়েছি। অনিতার মা কিছু জিজ্ঞাসা করছিল, কিছু না বলে চুপচাপ শুয়ে আছি। মাথায় কেবল একটা বিষয়ে কাজ করছে,- টাকা! টাকা! টাকা! আর ছেলেমেয়েদের সুখ! এইসব ভাবতে ভাবতে রাত প্রায় বারোটা হবে, হঠাৎ করেই বুকের ব্যথাটা বেড়ে গেছে। ধীরে ধীরে আমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি... আমার হাত পা গুলো অকেজো হয়ে আসছে, আমার সারা জীবনের অনেক স্বপ্ন অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সেইসব চিন্তাগুলো এখনো আমার পিছু ছাড়ছে না!!

পরদিন সকাল বেলা সবাই কান্নাকাটি করছে, আমার ছোট মেয়ে আর স্ত্রী সবচেয়ে বেশি কাঁদছে। শুনলাম বড় মেয়ে ইতি আমার অসুস্থতার খবর পেয়ে এরই মধ্যে এসে পড়েছে। সবার দিকে চেয়ে থাকলাম। অনেক কিছু বলতে চাইছি কিন্তু কিছুই বলতে পারছি না! ঠিক দু মিনিট পর... আর কিছু

জানি না!
—সব শেষ!!!

।। তিন।।

এই ভাবেই হারিয়ে যাচ্ছে অনেক বাবা। আর
বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শত শত
ছেলে মেয়ে, হয়তো অনেকে এখনো জানে না
তাদের বাবার মৃত্যু রহস্য! এই ভাবেই প্রতিনিয়ত
আমরা হারাচ্ছি আমাদের প্রিয় বাবাদের।।

বাণী বন্দনা

নেহা দেব
৩য় সেমিষ্টার

বিদ্যার দেবী তুমি
দেবী সরস্বতী,
তোমারে করিয়া স্মরণ
করি উন্নতি,
ধারণ করেছে তুমি
নিজ হাতে বীণা,
সংগীত জগতে করি
তোমারই বন্দনা,
পরনে শ্বেত বস্ত্র তোমার
বিরাজ করে রাজহংসে
মাগো তুমি লহ প্রণাম
আমার এই কবিতার অংশে।

নারী

রিথী রায়
৩য় সেমিষ্টার, বাংলা (সাম্মানিক)

নারী তুমি বড়ো বিচিত্রময়ী, কেউ বুঝবে না
তোমাকে
নারী তুমি রহস্যময়ী, কারোর চেনার দরকার নেই
তোমাকে।
নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার কেউ দেবে না
অধিকার,
সব বাধা অতিক্রম করে করতে হবে এর প্রতিকার।
যারা ভাবে নারীরা পারে না কিছু করতে,
জেনে নিও তারা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে
পারে না চলতে। কে কি বলল তাতে দিও না
অগ্রাধিকার,
বরং নিজের রাস্তায় চলে তাদেরকে করো ধিক্কার।
মা-বাবা অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের শিক্ষা
নিয়ে চলো,
ভুল করলে তারা হাত ধরে চলতে শেখাবে আরো।
নারী বলে নিজেকে ভেবো না কম কিছুতে,
মনে রেখো কাদম্বিনী বসু, সারা ক্যাথরিন
গিলবার্টের মতো নারীদের।
নারীর সহ্য ক্ষমতা পৃথিবীকে করেছে হতবাক,
তাইতো তুমি বাক্যবিহীন কষ্ট নিয়েও করছো রাজ।

ভালোবাসার ছন্দ

নারায়ণ দাস
শিক্ষাকর্মী

বলতে পারো?
কোন মেঘেতে বৃষ্টি আসে
কোন মেঘেতে 'সূর্য'
কোন মেঘেতে 'শিরি হাওয়া'
কোন মেঘেতে বজ্র।

কোন গগনে তারার মেলা
'শুকতারা' অরুন্ধতী
কোন আকাশে পূর্ণিমা চাঁদ
নিশীথ প্রদীপ বাতি

কোন হাওয়াতে ভেসে বেড়ায়
মিষ্টি-মধুর শব্দ
কোন দিঘীটার শীতল জলে
ফোটে আমার 'পদ্ম'।

কোন বাগিচায় নীল ভোমরা
গুনগুন গান গায়,
কোন বাতাসে জংলি ফুলের
সুবাস পাওয়া যায়।

কোন সুরটি মন ছুঁয়ে যায়
নিত্য আমার সাথী,
কোন শাখাতে দোল খেয়ে যায়
হলদে 'সোনাপাখি'।

কোন বনে'তে পেখম মেলে
নাচে 'ময়ূরী'
কোন মনেরই কৃষ্ণ রাধায়
হয় না ছাড়াছাড়ি।

পারলে না ভাই পারলেন না তো
এমন সহজ ধাঁধা
আজ তাহলে বলবো না আর
থাক সে বুকে বাঁধা।

অপরিচিতা

পিয়ালী দেবনাথ
১ম সেমিস্টার, বাংলা, এম এ

মনে পড়ে পুরানো দিনের কথা
পুরানো দিনের সময়
আর পুরানো দিনের মানুষ
আজ সেই পুরাতনদের কাছে
আমি হয়েছি প্রাক্তন

চলেছি নতুন থেকে নতুনের দিকে
নতুনতর হয়ে
আর এই চির নবীনদের মাঝে
আমি সেই পুরানো অপরিচিতা

মেয়েরা মা

সামিম মন্ডল
দ্বিতীয় বর্ষ (সাধারণ)

মেয়ে মানেই হেসো না জোরে, কথা বলা কম,
কেন? তারা কি রামগরুড়ের ছানা নাকি ধরবে তাদের যম।
সন্ধ্যা হলেই ভয়ে ভয়ে ফিরতে হয় বাড়ি,
কোথায় কখন জন্তু-জানোয়ার দেয় হাতছানি।
কাপুরুষের দলে নাম লেখায়নি অনেক পুরুষ,
তোদের জন্য মাথা হেঁট করাতে লেগেছে নাকি হুরুস।
তোদের জন্য তো খোলাই আছে বারাঙ্গণা পল্লীটা,
তারাও বাঁচুক খেতে পেয়ে তোরাও তোদের খিদে মেটা।
আট থেকে আশি কাউকে ছাড়তে রাখিসনি তোরা বাকি-
করিস না এমন, ভাঙ্গিস না স্বপ্ন, মারিস না রে প্রাণ,
মেয়েটা যে 'মায়ের জাত' এতোটুকু তো মান।

পণের বিরুদ্ধে পণ

শান্তনু সরকার
তৃতীয় বর্ষ, বিএসসি

আজকে আমরা মানুষ বলে
দিই পরিচয়।
কোথায় গেল সেই মানুষের
লজ্জা-ঘৃণা-ভয়।
মানুষ আজ আর নেইকো মানুষ
হয়েছে পশুর দল।
তাইতো তারা মেয়েদের উপর
দেখায় তাদের বল।
হয়েছি আমরা আধুনিক আজ
এই যুগেতে দাঁড়িয়ে,
কিন্তু মোদের যায়নি আজও
পশুবৃত্তি বেরিয়ে।
তাইতো আজও কত গৃহবধূ
ঝুলছে গাছের ডালে।
পণপ্রথা তার হয়েছে দড়ি
জড়িয়ে তার গলে।
কেন আজও সেই ঘৃণ্য প্রথা
জিইয়ে রাখছি মোরা,
সমাজ থেকে উপড়ে ফেলো
কু-প্রথার এই গোড়া।
এই কি তাহলে শিক্ষিত সমাজ
বিজ্ঞান দিয়ে ভরা,
সেই নারী হতে জনম মোদের
ভুলিগো কেমনে মোরা।
কখনো যাকে মা বলিয়া
করিগো তারে পূজা,
কি করে সেই নারীর পরে
চাপাই পণের বোঝা।
বিবাহ নামক পবিত্র বন্ধন
কেমন করে ভাই?
পণ নামক বাটখারা দিয়ে
ওজন করা যায়।
নিজের আপন মা বাবাকে
ত্যাগ করিয়া যে,
শ্বশুর এবং শাশুড়ির মধ্যে
পিতা-মাতা পায় সে।
কেমন করে সেই পিতা মাতা
এমন নিষ্ঠুর হয়?
মেয়ে সমান বউকে দিয়ে
পণ আনতে কয়।
তারা কি কখনো ভাবেনা একটু
নিজের দিক দিয়ে
তার ঘরের মেয়েকেও একদিন
দিতে হবে বিয়ে।
তাইতো মোদের সবাই মিলে
করতে হবে পণ।
পণ দেওয়া নেওয়া করবোনা মোরা
পণের হবে অবসান।

আলোকবর্ষ

সৈকত বিশ্বাস
৩য় সেমিষ্টার, বাংলা (সাম্মানিক)

প্রতিদিন নদীর পাশে বসে
দূরে যে গাছটা খুব খুব প্রিয় বলে মনে হয়!
হয়তো কাছে গেলে খুব পরিচিত হবে;
কিন্তু দূরে থেকেই দেখতে থাকি।

দূরত্বটা খুব বেশি নয়
একটি তারা থেকে আরেকটি তারাই যেতে;
আঙ্গুল যতটা সরাতে হয়
আমাদের দূরত্ব ততটাই।

বিদায় বেলার অনুভূতি

সঞ্চিতা দাস
৩য় সেমিষ্টার, বাংলা (সাম্মানিক)

ফোটে যে ফুল আঁধার রাতে ঝরে ধুলায় ভোরবেলাতে,
যেদিন আমি যাব চলে সবার থেকে দূরে,
ছেড়ে যেতে চাইবে না মন বাঁধনহারা প্রেমে।
বহু আশা নিয়ে এসেছিনু তব দ্বারে,
শত ব্যথা বুকে নিয়ে আসিলাম ফিরে।
সেদিন ভেবেছিলাম ভালোবাসতে পারবো তোমায়, তোমায় আপন
করে নিতে।
আজ বিচ্ছেদের শেষ দিনে এসে শব্দে বাক্যে ভাষায়, পারবো না তোমায়
বোঝাতে।
তাই আজ বিদায় বেলায় চোখের জলে,
দিয়ে গেলাম তোমার পায়ে অঞ্জলি।
শপথ নিলাম তোমার শিক্ষায় আমার মনুষ্যত্বে,
তুলতে দেব না কাউকে কখনও তর্জনী।।

নারী দশভূজা

টিনা ঘোষ
বাংলা অনার্স, দ্বিতীয় বর্ষ

তুমি নিপীড়িত অত্যাচারিত
কই তুমি করুণাময়ী
একহাতে নতুন গড়ো অন্যহাতে পুরনো ভাঙো
ভাঙা-গড়ার মাঝেই যে
তোমার প্রতিবাদী চিৎকার
যাকে করো তুমি মানুষ
দেখো চেয়ে দেখো একবার
সেই যে করে তোমাকে পতিত
তবুও আশান্বিত তুমি,
আবার করো শুরু শেষ থেকেই।
ঘরের রান্না তো বাইরের অফিস
হাজার লোকের বা রোধ করা যে তোমারই কাজ
তাই তো তুমি মহান, নারী তুমি যে সত্যিই মহান
পৃথিবীর যত আশ্চর্য সৌন্দর্য সবই তোমার তুলনা সমান
তাই তো দশভূজা নারী, তুমি মহান।

স্বপ্নের দিনগুলি

সুদীপা সাধু
৩য় সেমিষ্টার, বাংলা (সাম্মানিক)

আজও আমার মনে পড়ে
সেই অচিন গাঁয়ের কথা
আবছা আলোয় স্পষ্ট ভাসে
দিগন্তহীন মাথা।

ছেলেবেলার দিনগুলিতে
সোহাগ দিয়ে কাছে
সাজিয়ে রাখি মনের কোনায়
হারায় যদি পাছে।

সেথায় আমার গ্রাম্য মায়ের
হৃদয় ভরা গান
মুদিয়া দুচোখ করুণরসে
জুড়িয়ে যেত প্রাণ।

তুলসী তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ
জ্বেলে ঠাকুর ঘরে
মিলিয়ে যেতেন মা যে আমার
নিশীথ নিঝুমপুরে।

কলমী লতার বদ্ধ জলায়
তুলতে শালুক ফুল
গ্রামের কিশোর-কিশোরীরা
যেত নদীর কূল।

এখন শুধু স্মৃতির কাছে
বোঝা হয়ে থাকা

রঙিন আজ এই চাঁদের দেশের
দমকা হাওয়ার টানে
গ্রামের শিশু হারায় কত
ধূম্র দিশার ঘ্রাণে।

বেকারত্বের জ্বর

সুকন্যা ব্যানার্জী
প্রথম যন্মাস, স্নাতকোত্তর (বাংলা)

বেকারত্বের জ্বরে পুড়ছে শরীর।
ডিপ্রেশন গিলে,
ডিগ্রির বোঝা গায়ে চাপা দিয়ে
শুয়ে থাকি!
তবুও এই জ্বর নামে না।
রোজ রাতের শেষে,
খোলা আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়াই-
কুয়াশার জলপট্টি দিই নগ্ন দেহে!
কাঁপুনি কমে,উষ্ণতা নামে;
তারপর এসে শুই বিছানায়।
সকালে আবার নিয়ম করে
থার্মোমিটারের পারদ চড়ে,
একশো চার!!
আমার মেধা মৃত্যুর কাছে হেরে
পুড়ছে দেখো চিতায়।
হাতটা যে বড্ড ছোটো আমার,
তাই বিনা পয়সায় বাঁচিয়ে দিল না,
—দিল না।
—মরে গেল আমার মেধা!
আসলে হাতটা যে বড্ড ছোট আমার;
তাই আমি আজও বেকার!

ইচ্ছে করে

দেবজৈতী ঘোষ
অতিথি অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ

আমার ভীষণ ইচ্ছে করে ,
তোমার কাছে গিয়ে বসবো—
বেশ কিছুক্ষণ,
হাঁ করে তোমার মুখের আদল গিলবো—
একবার দুবার তিনবার ক'রে তোমার চোখের
পলক পড়া গুনবো।
তোমার সমস্ত মুখভঙ্গী ছবি তুলে, গুছিয়ে রাখবো—
মনের খাঁচার ভেতরে!
ভীষণ ইচ্ছে করে, তোমাকে আকাশে উড়তে দেবো;
আর তোমার ডানার আলোড়নে—
আমার বন্ধ ইচ্ছেগুলোকে মুক্ত হতে দেখবো!
ইচ্ছে করে জানতে,
অনেক অনেক দিন দূর থেকে
ফিরে আসার পর,
আমাকে পেয়ে তুমি কি কি করো!
খুব ইচ্ছে করে, ইচ্ছে ক'রে হারিয়ে যেতে
গভীর অরণ্যে,
খুজঁতে খুজঁতে তুমি একাই
চলে আসবে সেখানে,
এসে প্রচণ্ড বকবে
আমায়,
বকতে বকতে আদর করবে খানিক!
আর আমি তোমার সেই পাগলপনা মুখটার দিকে হাঁ করে
তাকিয়ে থাকবো-
ভীষণ ইচ্ছে করে।

দুঃসময়

জয়ন্ত মুখার্জী
ল্যাব এটেনডেন্ট (পদার্থ বিদ্যা)

ঝড় একদিন থামবেই, জানি
পৃথিবীও হবে শান্ত,
ওরা তো আর উঠবে না জেগে
চির বিদায়ের পান্থ।
ভোরের পাখি গাইবে কি গান
আবার আগের মতন?
না কি শঙ্কিত বুকে থাকিবে
ছোট্ট শিশুর স্বপন!
গোধূলি লগ্নের রক্ত লালিমা কি
মুছে যাবে হবে শেষ?
তমসা কালিমা গ্রাস করে নেবে
রবে না আলোর লেশ?
কি জানি কেন যে অকাল অশনি
বিনা মেঘে মেঘনাদ,
হুংকার দেয় রক্ত নেশাতে
মানব শমন জহ্লাদ।
স্নেহের পরশ হারালো যে আজ
কোথায় কি তা জানি?
আজব তোমার খেলা ঈশ্বর
আজব তোমার বাণী।

ব্যথা

অপর্ণা মহন্ত চক্রবর্তী
অতিথি অধ্যাপক, জার্নালিজম এন্ড মাস্ কমিউনিকেশন্ বিভাগ

এই যে দূরত্ব ভালোবাসার মাঝে কাটা বিছিয়ে দিচ্ছে রোজ,
একটা আলিঙ্গন কি তার হিসেব ধরে রাখতে পারবে?
প্রিয়, তুমি শুধু পরবর্তী আলিঙ্গনের অপেক্ষায় এই
সময়টাকে যেতে দিও না।
এমন কোনও ছাপ রাখো, যেন এই ব্যাথা আমাদের ব্যবধানকে হারাতে না পারে।
পৃথিবীর অসুখ সারাতে আজ আমরা সবাই দুরে দুরে থাকি।
সে সুস্থ হলেই , আবার ভালোবাসাময় দিন ফিরে আসবে।
কথা দিচ্ছি, এমন দিনের অপেক্ষায় যত তীড় আমার বুকে রোজ বিষের মতো বিধে আছে,
সেই সব প্রতিটা ক্ষতে একটা করে সূর্যমুখী ফোটাবো।

বেকারত্ব

সহদেব দাস
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বেকারত্ব যেন বুলডোজার
ভারীক্কী বিশাল, গতি শ্লথ
কেবল গোদাইলস্করি চাল।
না পারে টানতে না পারে বহিতে
ঝিমুনি যেন ওর জন্মগত।
পথকে করে কঠিন ও সুগম
তবুও কদর ক্ষীন অতি
অন্য যানের চেয়ে,
আপাত চোখে অকর্মন্য
নাকে কাঁদা নাকি তার স্বভাব!
তাইতো আজও বেকারত্বে
যোগ্য মর্যাদা ও সম্মানেরই অতি বড়ো অভাব।

অতীশ দীপঙ্কর (জীবনী)

শুভা চক্রবর্তী
৩য় সেমেষ্টার, ইতিহাস বিভাগ

"বাঙালি অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালি দীপঙ্কর।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই ভাষাতেই এই মহান পণ্ডিতের বন্দনা করেছেন। শ্রীজ্ঞান 'অতীশ দীপঙ্কর' তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, সুতীক্ষ্ণ মনীষা এবং অধ্যাত্ম মহিমায় বাংলার মানুষের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। দর্শন, ধর্ম সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য ও উজ্জ্বলকর। কেবলমাত্র বাংলার নয়, সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ জন জ্ঞান সাধকের মধ্যে তিনি অনন্য স্থানের অধিকারী। এক জমিদার পরিবারে ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে মতান্তরে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের বিক্রমপুর জেলার বজ্রযোগী গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর মাতার নাম প্রভাবতী, পিতা ছিলেন জমিদার কল্যাণশ্রী। অতীশ দীপঙ্করের পিতৃপ্রদত্ত প্রকৃত নাম ছিল 'চন্দ্রগর্ভ'। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু ও মেধা সম্পন্ন। জেতারী নামে এক পণ্ডিতের কাছে তিনি কম বয়সে হীনযান ও মহাযান মতে ত্রিপিটক এবং যোগাচার দর্শন চতুষ্টয় ও অন্যান্য শাখায় জ্ঞান অর্জন করেন। ধীরে ধীরে জ্ঞান লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় তিনি পরিপূর্ণ হতে থাকেন। জ্ঞান পিপাসা নিবারণের জন্য তিনি গৃহত্যাগী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এই সময়ই বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কৃষ্ণগিরির রাহুল গুপ্তের কাছে তাঁর অধ্যাত্ম শিক্ষা লাভ করেন। এরপরই তিনি চলে গেলেন দন্ডপুরীর মহাবিহারে মহাচার্য নীল রক্ষিতের কাছে, তিনিই প্রধানত চন্দ্রগর্ভকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাদান করেছিলেন। তখন থেকেই তার নাম হয় 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'। তাঁর বয়স মাত্র ১৯ বছর। জ্ঞান লাভ করার জন্য ও সাধনার জন্য তিনি দেশত্যাগী হয়ে সুমাত্রা চলে যান। সেখানে তিনি মহাযোগী, মহাজ্ঞানী, চন্দ্রকীর্তির কাছ থেকে দর্শনশাস্ত্র এবং বোধি চর্চার বহু গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন।

জীবনের সুদীর্ঘ ১২ বছর সুমাত্রা দ্বীপে জ্ঞানান্বেষণে অতিবাহিত করেন। তারপর ৪৩ বছর বয়সে অধ্যাত্ম সাধনায় ও ধর্মশাস্ত্রে পরম পারদর্শিতা লাভ করে ফিরে আসেন প্রাচীন ভারতের মগধে। মগধের রাজা ও জনগণ তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে 'ধর্মপাল' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীতে মগধের রাজা ন্যায়পাল দেব তাকে বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রধান আচার্যের পদে নিয়োগ করেন। এই সময় নানা দিকে অতীশ দীপঙ্করের পাণ্ডিত্যের কথা, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় কাজে তাঁর দক্ষতার কথা ও সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মগধে অবস্থান করছিলেন যখন তিনি তখনই বৌদ্ধধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তাকে তিব্বতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে তিব্বত রাজা বিক্রমশিলায় দূত প্রেরণ করেন। এইসময় বৌদ্ধ ধর্মের খুবই সংকট চলছিল কিন্তু সে সময় হাতে প্রচুর কাজ থাকায় তিনি তিব্বতে যেতে পারেননি। তিব্বত রাজের দূত ফিরে গেলেন ব্যর্থ মনোরথ নিয়েই।

নিজের বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে নিহত হলে তিব্বত রাজের পুনশ্চ তিব্বতের রাজা হন। তিনিও পিতার মতোই দীপঙ্করকে তিব্বত এসে বৌদ্ধধর্ম পুনরুজ্জীবিত করার আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি এবারে তিব্বতে যেতে রাজি হয়েছিলেন।

১০৪০ সালে সুদীর্ঘ পর্বত সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে তিনি তিব্বতের 'গুজো' নামক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন সেখানে রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনী তাকে স্বাগত জানায়। স্বয়ং তিব্বত রাজও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরে রাজপ্রাসাদে তাকে পূর্ণাঙ্গ সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'হো-কে-জে' অর্থাৎ 'ভট্টারক' উপাধি প্রদান করা হয়।

১০৪২ সাল থেকে অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। তিনি সারা তিব্বতের শহরে, গ্রামে গঞ্জে, ধর্মীয় পীঠস্থানে ধর্মপ্রচার কার্য চালাতে থাকেন। তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্যে ও অসাধারণ বাগ্মিতায় দেশের মানুষ মুগ্ধ

হয়ে যায় তারা হারানো বিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করে। কথা ছিল তিনি তিব্বতে তিন বছর থাকবেন। কাজ শেষ করে আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু তিব্বতে গিয়ে সেখানকার মানুষজনকে ভালোবেসে ছিলেন। তিব্বতীরা তাকে এতটা সম্মান দিয়েছেন যে তিনি সেসব ছেড়ে আর দেশে ফিরতে পারেননি। তিনি লামা ধর্মের প্রবর্তক হওয়া সত্বেও লামা উপাধি গ্রহণ করেননি।

১০৫৪ সালে তিব্বতের ন্যাথাং বিহারেই তিনি প্রায় ৭৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

১৯৭৮ সালে চীনে রক্ষিত তাঁর চিতাভস্ম বাংলাদেশে এনে কমলাপুরে বৌদ্ধ বিহারে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার তাঁর জন্মভূমি বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে তাঁর নামে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পুরুষ

শামীমা আক্তার
৩য় সেমিষ্টার, ইংরেজি (সাম্মানিক)

পুরুষ মানুষকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না,
আবার বাবার অসুস্থতার সময়ে যে-পুরুষ বন্ধুটি রাতের পর রাত আমার সাথে জেগে ছিল তাকে আমি অবিশ্বাস করতে পারবো না!

পুরুষ মানুষ কখনোই কি সৎ হতে পারে না,
আমার বাবা একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন। কোম্পানির লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ করেছেন কিন্তু কখনো ঘুষ নেন নি। তিনি তার ফলশ্রুতিতে সর্বপ্রকার অসুস্থতার সময়ে অন্যের কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতছেন। সেই বাবা নামের পুরুষটিকে আমি অসৎ ভাবি কি করে!

পুরুষ মানেই নাকি সুযোগ সন্ধানী,
কিন্তু আমি যখন কলেজ স্ট্রিটে বই কিনতে যেতাম তখন আসার সময় রাতের বেলা বন্ধুর কাঁধে মাথা রেখে স্টেশনের পর স্টেশন অতিক্রম করতাম। চাইলেই তো সে তার সুযোগ নিতে পারত কিন্তু সে তা করেনি। সেই বন্ধু নামের পুরুষটিকে সুযোগসন্ধানী ভাবি কি করে!

পুরুষ মানুষ মানেই নাকি স্বার্থপর,
কতবার কত পুরুষ বাসের ভিড়ের মধ্যে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমাকে বসার সুযোগ করে দিয়েছে, তাহলে আমি সেই সব পুরুষকে স্বার্থপর ভাবি কি করে!

পুরুষ মানুষকে নাকি ঠিক ভরসা করা যায় না,
কিন্তু আমাদের সংসারে টানাপোড়েনের সময়ও আমার বাবা নিজে না খেয়ে আমার কথা ভেবে টাকা জমিয়ে রাখত পড়াশোনার খরচের জন্য এবং আমি ভাবতাম আমার বাবা যে করেই হোক আমায় টাকা দেবে। তাহলে আমি সেই বাবা নামের পুরুষটিকে ভরসাহীন ভাবি কি করে!

পুরুষ মানুষ মানে কি বদনজরে তাকায় মেয়েদের দিকে, একদিন লাল শাড়ি পড়ে আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম বন্ধুর অপেক্ষায়। তারপর বন্ধুটি আসার পর আমাকে বললো তোকে কি আমি একটু এক মিনিট ধরে দেখতে পারি। চাইলেই তো সে আমায় আড়াল থেকে কুনজরে দেখতে পারত। তাহলে আমি এই বন্ধু নামের পুরুষটিকে কুনজরী ভাবি কি করে!

পুরুষ মানুষ মানেই কি ধর্ষক,
যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে বলে আত্মতৃপ্তির মাধ্যমে যে আমি আমার স্বামীর মধ্যে বাবার ছায়া দেখতে পাই, তখন সেই পুরুষ কি ধর্ষণের মত জঘন্য কাজ করতে পারে!

পুরুষ মানুষ মানেই নাকি খুব কঠিন হৃদয়ের অধিকারী, কিন্তু বাবা যখন তার মেয়েকে বিদায় দেয় শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার সময় তখন বাবা সবার আড়ালে চোখের জল ফেলে, তখন সেই বাবা নামের পুরুষটিকে কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ভাবি কি করে!

এই পৃথিবীতে যেমন ধর্ষণকারী, জঘন্য, নোংরা, সুযোগ-সন্ধানী পুরুষ আছে, তেমনি বাবার নামে আছে ভরসা করা পুরুষ, বিশ্বাস করার মতো স্বামী নামের পুরুষ, বিপদে পাশে দাঁড়ানোর মতো বন্ধু নামের পুরুষ, প্রচণ্ড ভাবে আগলে রাখার জন্য ভাই নামের পুরুষ।

"সারে জাহা সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা..."

সাবিকুন নাহার
৩য় সেমিষ্টার, বাংলা (সাম্মানিক)

সকাল থেকেই চেনা সুরে চেনা গানে বাদলের ঘুমটা ভেঙে গেছিলো। বর্ষা বাদল দিনে পাড়ার এই ক্লাবটার চাতালে শুলে কেউ খুব একটা কিছু বলে না। তবে খুব জোরে বৃষ্টি এলে রাতে আর ঘুম হয় না বাদলের, জলের ঝাপটা থেকে বাঁচতে চুপটি করে বসে থাকে, সেই সাথে সঙ্গী হয়ে জুটে যায় রাস্তার দু একটা কুকুর। বাদল-দিনের সংগ্রহ একটা রুটি ছিঁড়ে দেয় কুকুরগুলোকে। তারাও খায়, বাদলও খায়। তারপর বৃষ্টি একটু ধরে এলে, কুড়িয়ে পাওয়া ছেঁড়া মাদুরের উপর নিজের পোটলাটাকে বালিশের মত করে শুয়ে পড়ে। লোকে বলে বাদল পাগল, বাদল জানে লোকে পাগলকে ভয় পায়। কিন্তু সে তো কাউকে ভয় দেখাতে বা তাকে দেখে কোন বাচ্চা ভয় পাক—এটা চায় না। সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় তার ক্ষুধা নিবৃত্তির আশায়।

সনাতনবাবু আজ মহা ব্যস্ত। এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি বলে কথা, তিন জায়গায় ফ্ল্যাগ তোলার সূচি আছে, সাথে বক্তব্য, যদিও এখন বিপ্লবীদের জন্য দেড়-দু মিনিট বললেই হয়।

ক্লাবে একটা পতাকা তোলার স্ট্যান্ড আছে। অনেকের ভিড় সেখানে, সনাতনবাবু এখনো এসে পৌঁছায়নি। কয়েকজন সদস্যের প্রস্তুতি চলছে। তাদেরই বাজানো গানটা ভেসে আসছে মাইক থেকে।

বাদল গানটা শুনছিল মন দিয়ে, খুব চেনা গান, কবে শুনেছিল আজ আর তা মনে নেই, যদিও এখন কিছুই মনে রাখতে পারে না বাদল। চান করা, জামা পরা, দাড়ি কাটা সবই আজ তার কাছে ইতিহাস হয়ে গেছে।

ক্লাবের সামনে একটা হৈ চৈ, একটা ভিড় জমায়েত হয়ে গেল, সনাতনবাবু চলে এসেছেন, ক্লাবের পাশেই তার দুধ সাদা নতুন স্করপিও গাড়িটা রাখা, সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে, প্রবীণ একজন সদস্য সনাতনবাবুকে নিয়ে এসে আদর করে পতাকা স্ট্যান্ডের সামনে পাতা চেয়ারে বসান; তারপর মাইকে এনাউন্স করেন— "আজ আমাদের মধ্যে এলাকার জনপ্রতিনিধি শ্রী সনাতন চক্রবর্তী মহাশয় এসে উপস্থিত। এত শত ব্যস্ততার মাঝেও যে উনি আজ আমাদের সময় দিয়েছেন আমরা অত্যন্ত বাধিত। আমি উনাকে অনুরোধ করবো, আমাদের ক্লাবের, আমাদের দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করার জন্য।"

"ভাই সকল আজ ১৫ই আগস্ট, আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম"—সনাতনবাবু বক্তৃতা শুরু করলেন।

চেনা গানটা বন্ধ হয়ে লোকটার বকবকানি ভাল লাগছিল না বাদলের।

"তোমরা জানো না আমাদের দেশের কত বীর সন্তান এই স্বাধীনতার জন্য নিজেদের প্রাণ দিয়েছিলেন, নিজেদের জীবনের চিন্তা তারা করেননি, লোভ লালসা সব বিসর্জন দিয়ে তাঁরা দেশের সেবা করে গেছেন আমরণ, সেসবের ফলস্বরূপ, আজ আমরা স্বাধীন, আজ আমরা মাথা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি।"

যত কথাগুলো কানে আসছে তত বাদলের পেটে খিদে পাচ্ছে, সেখান থেকে বেরিয়ে এল বাদল, সনাতনবাবু দুধসাদা গাড়িটার পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে চোখে পরলো গাড়ির সামনের সিটে রাখা কতগুলো খাবারের প্যাকেট, হাত বাড়ালেই সেগুলো নাগালের মধ্যে। বাদল দাঁড়িয়ে গেল গাড়ির জানালার সামনে।

"লোভ, হিংসা ছোটবেলা থেকেই ত্যাগ করা উচিত, আমাদের সকলকে সৎ হতে হবে, দান ধ্যানের দিকে নজর দিতে হবে, আমাদের আশেপাশেই কত মানুষ এক মুঠো ভাতের জন্য অনাহারে আছে কিনা সেদিকে আমরা খেয়াল রাখব। গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করবো, তবেই না এই পৃথিবী সুন্দর ভাবে গড়ে উঠবে।"

ক্লাবের পাশে রাখা ইঁটে পড়ে গিয়ে বাদলের মাথাটা ফেটে গেল, সনাতনবাবু দেহরক্ষীর জোরালো ধাক্কায় বাদল টাল সামলাতে পারেনি, একটা জোরালো শব্দে সনাতনবাবুর সাথে সেখানে আর যারা ছিল সকলের দৃষ্টি বাইরে চলে গেল। সদ্য কেনা গাড়িটার সামনে কিছু একটা হচ্ছে সেটা আন্দাজ করে সনাতনবাবু বক্তৃতা থামিয়ে দৌড়ে এলেন। গত মাসেই যে কিনেছেন গাড়িটা অনেক টাকা দিয়ে। স্যার আপনার গাড়ির ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে কিছু একটা নেওয়ার চেষ্টা করছিল, বারণ করাতে শোনেনি, ধস্তাধস্তি করায় নিচে পড়ে গেছে। সনাতনবাবু দেখলেন তার সাদা গাড়িটায় কালো নোংরা ছোপ, সহ্য করতে পারলেন না আর, সজোরে এক লাথি মারলেন মাটিতে পড়ে থাকা বাদলের পেটে, বাদল যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলো, সনাতনবাবু আর একটা লাথি মারলেন আর লক্ষ্য করে বললেন -"শুয়োরের বাচ্চা, আমাদের দেশের পাগল-ছাগল গুলোকে পিটিয়ে মেরে ফেলা উচিত, যত্তসব দেশের জঞ্জাল।'

কে যেন আবার গানটা বাজিয়ে দিয়েছে, মাইক থেকে চেনা গানটা বাদলের কানে ভেসে এলো -"সারে জাহা সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা..."

ক্ষণিকের স্মৃতিচারণ

দীপা রায়
৩য় সেমেস্টার, বি.এ. সাধারণ

আদিত্য: হ্যালো... বীথিকা??
বীথিকা: হুম... বলো।
আদিত্য: কোথায় ছিলে? কতবার কল করলাম...
বীথিকা: ও...
আদিত্য: "ও..." মানে?? কি হয়েছে বলোতো? অণু ঠিক আছে?
বীথিকা: হুম...
আদিত্য: আচ্ছা... শোনো আমি আজ জলদি বাড়ি আসছি।
বীথিকা: আচ্ছা আসো।

বছর ২৫ এর যুবতী বীথিকা। পুঁথিগত শিক্ষা কম হলেও জীবনবোধের শিক্ষাটা মন্দ নয়। আজ ওর মনটা খুব একটা ভালো নেই বললেই চলে। গতকাল রাতে আদিত্যর সাথে একটু ঝামেলা হয়েছিল বটে, তবে আজ সকালের ঘটনাটা যেন আরো বেশি ভাবুক করে তুললো বীথিকাকে। কয়েকদিন ধরেই অফিসের কাজে ডিস্টার্ব ছিল আদিত্য। তাই আজ সকালে না বলতে চেয়েও বলে ফেলল "অণু যদি আমার নিজের মেয়ে হতো...", তারপর প্রায় তাড়াহুড়ো করেই বেরিয়ে গেল আদিত্য। সেই ঘটনার পর থেকেই বীথিকা চুপচাপ রয়েছে। অণুর বকবকানিকেও সে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আধভেজা চোখে সে ভাবতে লাগলো দুই বছর আগের সেই রাতের কথা, যে রাতে আদিত্য ওকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল। "বিয়ে" শব্দটার সঙ্গেই বীথিকার যেন এক শত্রুতা তৈরি হয়েছিল। তাই সে ভাবতেও পারেনি কেউ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে। কথাটা তার হৃদয়ে ভালোলাগার অনুভূতি আনা মাত্রই ওর মনে পড়ে গেল এক বছরের একমাত্র মেয়ে অণুর কথা। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আদিত্য নিজেই বলল "অণু আমার মেয়ে হয়েই থাকবে... চাইলে বাবা বলেও ডাকতে পারে"। হঠাৎ করে বুকের পাথরটা যেন নেমে গেল, ছল ছল চোখে তাকিয়ে থাকলো আদিত্যর দিকে আর ভাবতে থাকলো এও কি সম্ভব? পরের দিন সকালেই আদিত্য গেল বীথিকাদের বাড়ি ওদের বিয়ের কথাটা বলতে। মেয়ের পুনরায় বিয়ের কথা শুনে যেমন খুশি হলেন তেমনি চিন্তিতও হলেন বীথিকার মা।" না.. মানে, বলছি যে... "আমতা আমতা করতে দেখে আদিত্য নিজেই বলে উঠলো আমি সব জানি কাকিমা। "বীথিকার যে আগে একটা বিয়ে হয়েছিল এবং তা আপনার অজান্তেই, তাও আবার..." ইতিমধ্যে বীথিকার মা বলে উঠলো হ্যাঁ বাবা তাইতো আমার চিন্তা ওকে কি কেও মেনে নিতে পারবে? আর অণুর কি হবে ওর ধর্ম জানার পরও কি কেও ওকে মেনে নেবে? ধর্ম নিয়ে আমি অত ভাবি না কাকিমা। ও ইকবালের মেয়ে হতে পারে কিন্তু আমি অণুকে নিজের মেয়ের মতোই দেখব। হুম... বীথিকার বাবা থাকলে হয়তো এখনকার সময়টা অন্যরকম হতো। এসব ভেবে আর কি হবে বলুন... আর একটা ভুল করেছে মানে তো এই না সারাজীবন তা বয়ে নিয়ে যাবে। আপনি তো আমায় চেনেন কাকিমা আমার উপর ভরসা নেই??? না.. না.. তা না.. তবে তোমার মা-বাবা?? ওদের আমি manage করে নেব.. "even now I'm adult enough anti" বলেই হেসে উঠল আদিত্য।

কয়েক মাস পরে আদিত্য আর বীথিকার বিয়ে হল। বিয়েতে পাড়াপড়শি যে খুব খুশি হয়নি তা বলাই বাহুল্য। আদিত্যর মা প্রথমে অখুশি হলেও ধীরে ধীরে মন জয় করেছে বীথিকা। ওদের বিয়েটা বিনাড়ম্বরে হলেও বিবাহিত জীবনে খুব একটা ঝামেলা ছিল না।

অণু: মা... ও মা এখনো ঘুমাচ্ছো???
বিথীকা: না... কি হয়েছে?

অনু: কিছু না...

গুটি গুটি পায়ে অণু বাইরে গেল। বীথিকা ভাবল সবই তো ঠিক ছিল কিন্তু এখন আদিত্য কি আর আমাকে মেনে নিতে পারছে না... ভাবতে ভাবতেই দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল।

অনু: দিদুন... বাপি তুমি দিদুনকে নিয়ে এসেছো...

আদিত্য: (চুপি চুপি) মা কোথায়??

অণু বাইরের ঘরে দিদুনের সাথে খেলতে থাকলো আর আদিত্য ঘরে এলো। আদিত্য হাসছে... বীথিকা নিশ্চুপ হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য গাইতে লাগলো "আয় আর একটিবার আয়রে সখা প্রাণের মাঝে আয় মোরা সুখের দুখের কথা কবো প্রাণ জুড়াবে তায়" বীথিকার মনের সমস্ত রাগ এতক্ষণে অভিমানে বদলে গেছে। গান গাইতে গাইতে আদিত্য বসল বীথিকার সামনে আর বলল জানো তো কয়েকদিন অফিসের কাজে খুব ব্যস্ত ছিলাম তাই সকালে ওই ভাবে বলে দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি জানি সবটাই। আমারও রাগ হয়েছিল কিন্তু তা ক্ষণিকের। মনে মনে অনেক দুশ্চিন্তাও করছিলাম কিন্তু সে সবই সাময়িক। এরপর দুজনে একসঙ্গে ঘরের বাইরে চলে গেল।

তৃতীয় সার্জারি

সামিন ইয়াসার

৩য় সেমিষ্টার, প্রাণীবিদ্যা (সাম্মানিক)

অঞ্জনবাবুর স্ত্রী পাড়ার প্রথম মহিলা যিনি এই গোষ্ঠীতে প্রথম সার্জারি করিবেন, (সন্তান জন্মানোর জন্য)। এ কথা পাড়ার সকলে জানে এবং ভয় পায়। পাবে নে কেন! সার্জারি হচ্ছে একটি বৃহত্তর ব্যাপার। এতে অনেক ঝুঁকিও থাকে, যেমন-রক্তমোক্ষণশীল, রোগ সংক্রামক, অ্যানেসথেসিয়া, সারা জীবনের জন্য থেকে যাওয়া ব্যথা এছাড়া তল পেটের দাগ।

প্রথম সার্জারি সুস্থ-স্বাভাবিক হলো। এক কন্যা সন্তান জন্মিল, তখন বাবা মায়ে অনেক আদর করে তার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায়নি।

অঞ্জনবাবুর বাবা ও শ্বশুরমহাশয় দুজনেই ছিলেন শাস্ত্র শিক্ষা-নীতি শিক্ষার পটুক, অর্থাৎ মাস্টারমহাশয়। ফলস্বরূপ তার মেয়ের হাতেখড়ির শুভকার্য সম্পূর্ণ করিলেন তার বাবা ও শ্বশুর মহাশয়।

অঞ্জনবাবুর স্ত্রীর পর পাড়ার অনেক মহিলা সার্জারি করিয়া সন্তান জন্ম দেন। চিকিৎসা ব্যবস্থা দিন দিন আরো উন্নত হতে থাকে। ইতিমধ্যে দু'বছর পর অঞ্জন বাবুর স্ত্রী আবার মা হতে চলেছেন।

দ্বিতীয় সময় অঞ্জন বাবু স্ত্রীর অনেক অসুবিধা হয়। ঠিকঠাক খাওয়া-দাওয়া হয় না। ঠিকঠাক ঘুমোতে দেয় না, পেট কাটার ব্যথা, তাছাড়াও রয়েছে অনেক সমস্যা।

যারা মা হয় তারা ব্যাপারটা অনুমান করতে পারছিলেন। সকলে আবার চিন্তিত, কারণ সেই সময় এর আগে দ্বিতীয় সার্জারি করেছে এমন কাউকে দেখেননি। এ যাত্রায় অঞ্জন বাবুর স্ত্রী কি বেঁচে ফিরে? এই ছিল তাদের মুখ্য প্রশ্ন।

নিরুপমাকে বাড়িতে রেখে তার মা জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে নার্সিংহোম পৌঁছালেন। তাকে দেখতে সকল ডাক্তার একসঙ্গে তার রুমে এলেন। তাদের কাছেও ব্যাপারটা খুবই নিত্যনতুন। অপারেশন চলাকালীন হঠাৎ অঞ্জনবাবু স্ত্রী জ্ঞান ফিরলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখতে পেলেন ডাক্তারদের কার্যকলাপ। তার বুঝে উঠতে সময় লাগলো না যে ডাক্তাররাও এ

বিষয়ে প্রথম কাজ করছেন।

দ্বিতীয় সার্জারি সাফল্য পেল। অঞ্জন বাবু হাস্যমুখে পাড়ার সকলকে খবর দিলেন। অঞ্জন বাবুর স্ত্রীর খ্যাতি আস্তে আস্তে পুরো গ্রাম ছড়িয়ে গেল। তবুও তাদের পরিবারের সবাই কেমন খুশি নয়। কারণ একটাই, আবার কন্যা সন্তান জন্মেছে।

তখনকার সময়ে পুত্র সন্তানের আশায় অনেক বাবা-মা পাঁচ-ছয়টা সন্তান জন্ম দিতেন। অঞ্জনবাবুও তার ব্যতিক্রম নন।

শ্বশুরবাড়িতে নিন্দা শুনে শুনে অঞ্জনবাবুর স্ত্রীও পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। কতই না বাবাকে দেখান, কতই না টোটকা ব্যবহার করেন তার হিসেব নেওয়া মুশকিল। অবশেষে দু'বছর পর অঞ্জন বাবু স্ত্রী আবারও মা হতে চলেছেন।

তৃতীয় সন্তান সুস্থ স্বাভাবিক হওয়ার জন্য যা যা দরকার তিনি সব করতে রাজি। শত কষ্টের পরেও তিনি এই সন্তান সার্জারি করে নিতে চান। কি খবর গ্রামের পর গ্রাম ছড়িয়ে গেল। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, ঈশ্বরকে ও ডাক্তারকে নিজের জীবন তুলে দিয়ে নার্সিংহোম এর দিকে পদার্পণ করেন।

সেই দিনের সব থেকে নামি দামি নার্সিংহোম " অধীর চৌধুরী নার্সিংহোম" এ তাকে ডেলিভারির এক মাস পূর্বে ভর্তি করানো হলো। নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস সে যেন পায় তার জন্য তার পিতৃগৃহের লোকজন, শ্বশুরবাড়ির লোকজন সর্বদায় উপস্থিত থাকতেন। আস্তে আস্তে ডেলিভারি তারিখ সামনে আসতে থাকে এবং তাকে দেখার জন্য ততই ভিড় বাড়তে থাকে। ডেলিভারি দিন তাকে ঘিরে নার্সিংহোমের সকল ডাক্তার ও নার্স দাঁড়িয়ে থাকে। এমনকি অনেক রোগীও তাকে দেখার জন্য অপারেশন রুমের বাইরে ধৈর্য নিয়ে বসে থাকে। নার্সিংহোমের বাইরে হাজারো মানুষ তার জন্য প্রার্থনা করছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান কি এতটা উন্নত হয়েছে যে একটি মেয়েকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? তার সন্তান কি বেঁচে থাকবে? এরূপ হাজারো প্রশ্ন তাদের মাথায় ঘুরতে থাকে। অপারেশন চলতে থাকে। সকলে নিজের নিজের প্রক্রিয়া বন্ধ করে প্রার্থনা করতে থাকে। কেউ ঈশ্বরের কাছে, কেউ আল্লাহর কাছে, কেউবা যীশুর কাছে। অবশেষে চিকিৎসা শেষ হয়। ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে বলেন ঈশ্বরের চমৎকারে মা ছেলে দুজনেই জীবিত।

ছেলে হয়েছে একথা শুনা মাত্রই পরিবারের সকলের নয়নের শিশির অশ্রু বিসর্জন হতে থাকে। ছেলে সন্তানের দাদু হতে তিনি এত খুশি যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থাকা হাজার রোগীকে মিষ্টিমুখ করান।

শত কষ্টকে দূরে রেখে, নিজের আত্মবিশ্বাস এবং তিন পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে, অঞ্জন বাবুর স্ত্রী যে মিরাকেল করেছেন তা আজও মিরাকেল রয়ে গেছে।

ঘরে ফেরা হলো না নিবেদিতার

বিশ্বজিৎ গাইন
৩য় সেমিষ্টার, বিএ (জেনারেল)

বয়স মাত্র পাঁচ মাস পাঁচ দিন। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, নিবেদিতা। যে কিনা এই গল্পের প্রধান আলোচ্য চরিত্র। অতি ক্ষুদ্র একটি পরিবার। পরিবারের সদস্য বলতে তেমন কেউ নেই। বাবা-মা আর ছোট ফুটফুটে মেয়ে নিবেদিতা। বাবা অফিসে কাজ করেন। মা ঘরের কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত চঞ্চল মেয়েকেও সামাল দেন। ছোট হলে কি হবে এই কয়েক মাসে তার বুদ্ধির বিকাশ সম্পূর্ণ ঘটে গেছে। জন্মের পরেই নিবেদিতার মুখে যখন তার মা প্রথম মা ডাক শুনে ছিল তখন তার খুশির সীমানা বাঁধন ভেঙ্গে চোখের জল হয়ে আসছে পড়েছিল মাটিতে। অত্যন্ত মায়াবী সে ডাক মা...।

নিবদিতার বয়স দিনকে দিন বাড়তে লাগলো। বাবা ঠিক করেছেন এবার তাকে পাঠশালাতে ভর্তি করবেন। যথারীতি বাবা মাস্টারমশাই এর সাথে কথাবার্তা বলে, নিবেদিতাকে পাঠশালাতে ভর্তি করলেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। সেখানে সে নতুন নতুন খেলার সাথী পেল। পড়াশোনায় সে ছিল অত্যন্ত মেধাবী। প্রতিটি শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করতো। এতে তার বাবা-মা খুব খুশি হতেন। ছোট মেয়ের স্বপ্ন ছিল সে বড়ো হয়ে মস্ত বড়ো ডাক্তার হবে। অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াবে, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেবে, আরো কত কিছু।

দেখতে দেখতে বছর চার কেটে গেল। সে এবার পাঠশালার গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হল। পড়াশোনার সুবাদে তাকে মাঝেমধ্যে কলকাতায় যেতে হতো। ১৪ বছর ১১ মাস ৩০ দিন পূর্ণ হলে, নিবেদিতা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসলো। যথারীতি পরীক্ষা সমাপ্ত হল। বাবা মেয়েকে জিজ্ঞাস করল মা পরীক্ষা কেমন হয়েছে? নিবেদিতা বলল— "কোন প্রশ্ন ছাড়িনি বাবা।" এতেই বাবা বুঝে গেলেন যে, মেয়ের পরীক্ষা দুর্দান্ত হয়েছে।

ফলাফল প্রকাশ হতে তিন মাস সময় লাগবে। এই তিনমাস সে ডাক্তারির প্রস্তুতি নেবে, সে ঠিক করেছিল, অন্য কাজে সময় ব্যয় করবে না। বিদ্যালয় থাকাকালীন হঠাৎ করে খবর আসে, তার বাবা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এই সংবাদ শোনার সাথে সাথে তার মাথার উপর যেন বজ্রাঘাত নেমে আসলো। চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্নময়, তার জীবনে নেমে আসলো ঘোর অন্ধকার। আলো দেখানোর পথ কে তাকে অনুসরণ করাবে? তার স্বপ্ন কি তাহলে স্বপ্নই হয়ে থাকবে? এইসব ভাবতে ভাবতে সে অজ্ঞান হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মাটিতে।

কয়েক ঘন্টা পর তার জ্ঞান ফিরলে, সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। আমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে। সে ঠিক করল টিউশন পড়ানো আরম্ভ করবে। এইভাবে সে নিজের পড়াশোনা চালাতে লাগলো। অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়ে নিজের স্বপ্ন পূরণের আশায় সে দিনরাত্রি এক করে দিল।

অবশেষে তিন মাস অতিক্রম হল। এবার মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হওয়ার পালা। যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশ হলো। জানা গেল সে বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৬৮৬। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন তার এই অসাধারণ ফলাফলের জন্য। কিন্তু তার বাবার স্মৃতি তাকে মাথাচাড়া দিয়ে তুলল। সে তার বাবার কাছে গিয়ে যদি একবার তার প্রাপ্য নম্বর দেখিয়ে বাবার পদধূলি ললাট স্পর্শ করতে পারতো তাহলে হয়তো বাবার স্মৃতিগুলো তাকে ব্যাকুল করে তুলতো না।

এগুলো চিন্তা করতে করতে এসে মাধ্যমিকের ফলাফলটা হাতে নিয়ে যখন রাস্তা পার হচ্ছিল তখন দ্রুতগতিসম্পন্ন একটি বাস তাকে পিষে দিয়ে চলে গেল। তৎক্ষণাৎ সেখানকার লোকজন নিবেদিতার রক্তাক্ত দেহটি দেখে ছুটে আসে এবং হাসপাতালে ভর্তি করেন। নিবেদিতা হাসপাতালের বেডে শুইয়ে মায়ের হাত ধরে বলে মা— "আমার আর ঘরে ফেরা হলো না" একথা বলেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

বৃদ্ধাশ্রম

সান্ত্বনা মণ্ডল
৩য় সেমিষ্টার, ইংরেজি (সাম্মানিক)

বৃদ্ধাশ্রম কথাটির সাথে আমরা সকলেই কম বেশি পরিচিত। শব্দটিকে একটু বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় বৃদ্ধের আশ্রম। "তাহলে কি বৃদ্ধ হলে এখানে থাকতে হবে দিদিভাই?" দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠরত মৃন্ময় আনন্দিত হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল। আমি মৃন্ময়ের গৃহশিক্ষিকা। আসলে বৃদ্ধাশ্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান মৃন্ময়ের নেই।

কলকাতার একটি বড় অফিসে মৃন্ময়ের বাবা তনয় গুহ চাকুরীরত। মৃন্ময়ের মা পৃথা গুহ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কর্মরতা। বাড়িতে ভৃত্য মালিনী সারাদিন মৃন্ময়ের দেখাশোনা করে। রবিবার বাদে অন্য সকল দিন মৃন্ময়কে স্কুলে যেতে হয়। আমি সপ্তাহে চারদিন পড়াতে যাই। পড়াতে গেলে মৃন্ময়ের কথা, গল্প ফুরাতেই চায় না। তার সাথে কথা বলার মানুষ খুব কম। স্কুল থেকে বাড়ি আর বাড়ি থেকে স্কুল পর্যন্ত তার জীবন সীমাবদ্ধ। বাইরের জগতের সাথে তার পরিচিতি খুব কম। তার দাদু, ঠাকুমা গ্রামের বাড়িতে থাকেন। সেখানে তাদের দেখার কেউ নেই। চাকরি পাওয়ার পর বিবাহ করে তনয় কাকু এখানেই কলকাতাতে বসবাস করেন। মালতি দিদির কাছে শুনেছি তনয় কাকু সপ্তাহে একবার তো দূরের কথা মাসে একবারও খোঁজ নেন না। তারা মালতি দিদির কাছ থেকে মৃন্ময়ের যাবতীয় খবরাখবর নেন। গ্রামের বাড়িতে একা থাকার কারণে মৃন্ময়ের দাদু, ঠাকুমা কিছু অসহায়, দরিদ্র, বৃদ্ধ মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন। তাদের অবসর সময় গল্প করে, অপ্রাপ্তির কথা চিন্তা করেই কেটে যায়। তারা মৃন্ময়কে দেখার সুযোগও পাননি এখনো।

হঠাৎ দেখলাম তনয় কাকু বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকছেন। তাই আমি মৃন্ময়ের প্রশ্নের উত্তরে একটু উচ্চকণ্ঠে বললাম, "হ্যাঁ মৃন্ময় ঠিকই বলেছ... বৃদ্ধাশ্রম খুবই আনন্দের, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা। যখন সন্তানের কাছে বোঝা হয়ে যায় বাবা-মা, বাবা মাকে ব্যাকডেটেড মনে হয় তখনই সেই বৃদ্ধ বাবা-মায়ের স্থান হয় বৃদ্ধাশ্রমে। তবে মাঝে মাঝে আনন্দ উপভোগ করার জন্য বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়া লাগে না। সন্তান, পুত্রবধূ, নাতি নাতনিকে ছেড়ে চার দেওয়ালের মধ্যে জীবন কাটাতে হয়। দুবেলা দুমুঠো ভাত সন্তানের স্মৃতিতে অশ্রু মিশ্রিত করে খেতে হয় তখন সেই বাড়ি সত্যিই বৃদ্ধাশ্রম।" কথা বলতে বলতে চোখের আগত অশ্রুকে বাচ্চাটির সামনে আমাকে আটকে রাখতে হলো। আড়চোখে দেখলাম তনয় কাকু সেন্টার টেবিলের পাশে এখনো দাঁড়িয়ে আছেন, হয়তো আমার কথাগুলো শুনছিলেন। মৃন্ময় আমার কথাগুলির অন্তর অর্থ কিছুই বুঝতে পারেনি... সেটা তার মুখ, চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তবে আজকের পড়ানো মৃন্ময়কে না, তনয় কাকুকে বোঝানোর স্বল্প প্রয়াস করেছিলাম আমি। তারপর মৃন্ময়কে বললাম, "জানো মৃন্ময়... আজ আমার দাদুর জন্য শাল আর ঠাকুমার জন্য শাড়ি কিনব। কাল আমার চাকরির প্রথম বেতন পেয়েছি, যদিও খুবই স্বল্প বেতন তবুও সেটা তাদের জন্যই খরচ করব যারা মায়ের মার থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন, সংসারকে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন, আমি স্কুল থেকে না ফেরা পর্যন্ত আহার গ্রহণ করেননি।" তারপর মৃন্ময়কে বাড়ির কাজ দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। জানিনা তনয় কাকুকে তার বাবা-মায়ের অবদান, মৃন্ময়ের জীবনে দাদু ঠাকুমার গুরুত্ব আমি বোঝাতে পেরেছি কিনা!

তিনদিন পর পড়াতে এসে ডোর বেল বাজিয়ে দেখি দরজাটা এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা খুললেন। তাকে নমস্কার জানিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে জানতে পারলাম মৃন্ময়ের দাদু ঠাকুমা এখন থেকে এখানেই থাকবেন। তনয় কাকু ওনাদের নিয়ে এসেছেন। মৃন্ময় দাদুর কোলে বসে মন খুলে হাসছে, খেলছে। তনায় কাকুর স্ত্রী ভিডিও কলে সবার সাথে কথা বলছেন। মনে মনে আমি শান্তি অনুভব করলাম। তবে একটি ভুল আমি করেছি। আমি বলেছিলাম আমার দাদু ঠাকুমা বেঁচে আছেন কিন্তু তারা আমার জন্মের পূর্বেই মারা গেছেন। কিন্তু আমার তাদের প্রতি মমত্ব, ভালোবাসা হয়তো তনয় কাকুর চোখে পড়েছে। তিনি ভিড়, ব্যস্ত, কোলাহলপূর্ণ জীবনের মধ্যে হারিয়ে ফেলা তার বাবা-মায়ের গুরুত্ব যে বুঝতে পেরেছেন, সেটাই যথেষ্ট। গ্রামের দুস্থ মানুষের সেবার জন্য তিনি কর্মচারী নিয়োগও করেছেন। ঘটনাটি আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উদ্বাস্তু

শ্রাবণী রায়
ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স,তৃতীয় বর্ষ

আমাদের পুরাতন বাড়ি ছিল বাংলাদেশের দক্ষিণে বলেশ্বর নদীর পুব পাড়ে। মফস্বল এলাকা তাও আবার সুন্দরবনের কাছে, বেশ কাটছিল দিনগুলি, কিন্তু এ বাড়ি জ্বালিয়েছে সৈন্যরা ও বাড়ি পুড়িয়েছে, এসব শুনলে গা শিউরে ওঠে। তাই বাড়ির বড়োরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন "আমাদের হয়তো এখানে আর থাকা হবে না"।

পরের দিন থেকে গুজগাজ শুরু হতে লাগলো, কারণ আমাদের পাড়ি দিতে হবে পশ্চিমবাংলায়। আমি তখন নেহাতই ছোট, তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। মা সেদিন বললেন আজ আমরা বেরোবো। আমি তখন এতই ছোট যে এইসব কথা বোঝার মত ক্ষমতা হয়নি। কিন্তু রাত তখন ৮-৯ টার মত হবে, আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম, শুধু আমি আর আমাদের পরিবারই নয়, আমাদের মফস্বলের বাজারের প্রায় সবাই চলেছে যেন এক বিরাট শোভাযাত্রা। আমরা পৌঁছালাম ঘাটে। আর তারপরে নৌকায় উঠে পাড়ি দিলাম, দেখলাম আমাদের মতই প্রায় ৬০০-৭০০ লোক সাতটা নৌকায় উঠে পড়ল। এই নৌকাগুলোকে আগে দেখেছি বটে কিন্তু এর আগে কখনো উঠিনি। এত বড় নৌকা আমি অন্য কোথাও দেখিনি। নৌকায় এখনকার দিনের মত কোন ইঞ্জিন ছিল না। মাঝিরা দাঁড় বেয়ে নিয়ে যেত। নৌকা চলত জোয়ার আর ভাটার টানে, আর দখিনা বাতাসে পাল তুলে দিয়ে। দীর্ঘকায়, আর সুদীর্ঘ নৌকা, মাঝিরা দাঁড় বেয়ে এগিয়ে যেত। আর নৌকার দাঁড় বাওয়ার সময় ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ আসতো। মাঝিরা একসঙ্গে গান গেয়ে গায়ের জোর খাটিয়ে নৌকা বাইত।

দাদাকে এই নৌকা গুলির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, দাদা বলল "এ হল রয়জুদ্দি কোম্পানীর নৌকা" এরা ব্ল্যাকে ব্যবসা করে, সুন্দরবনের পথ ঘাট এদের চেনা, এরা ব্ল্যাকে ভারত থেকে বিড়ির পাতা, গম আরও সস্তার জিনিস এদেশে আনে। আর বাংলার সস্তার জিনিস নিয়ে যায় ভারতে"।

সেদিন রাতে নৌকায় ওঠার পর, দেখলাম কারো মনেই কোন অনুশোচনা নেই, কেউ কাঁদছেও না, এর কারণটা যদিও আমি পরে বুঝতে পেরেছিলাম। রাত তখন প্রায় গভীর যে যার নৌকায় ঘুমাচ্ছে, আর চারদিক নিস্তব্ধ শুধু শোনা যায় মাঝিদের চিৎকার। আর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। এভাবে কখনঘুমিয়ে পড়েছিলাম মায়ের কাছে নিজেও বুঝতে পারিনি। পরের দিন যখন ঘুম ভাঙল তখন প্রায় ভোর ভোর হবে। দেখলাম সবাই আমোদ করছে। বড়োদের মুখে যেনবুলি ফুটেছে, কেউ আবার জয়ধ্বনি করছে। আশ্বিনের সকালে হালকা হালকা হিম পড়ছে। আর ওদিকে নৌকোর একপ্রান্তে উনুন জ্বলছে। সকালের কুয়াশা কাটিয়ে সূর্য তখন উঠছে সবে, দেখি এর কোথায় এলাম। এ তো চারিদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল, খালের পাড় বরাবর গোল পাতার গাছ, আর তারপর সুন্দরী গাছের জঙ্গল, জঙ্গল যেন ভেতরে আরো গভীর হয়ে গেছে। গাছের ডালে ডালে বানরের দল। এ গাছ থেকে ও গাছের ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মা আমায় বলল, "মনু' হাতমুখ ধুয়ে নে', আমরা আজ সারাদিন এখানেই থাকবো - এ জঙ্গলে।"

-'মা, সবাই এত আনন্দ করছে কেন?"

-'মনু আমরা India তে ঢুকে পড়েছি", আর পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের ধরতে পারবেনা।' এ তো পুনর্জন্ম- তা সবাই আনন্দ করবে না।"

দাদার মুখে শুনেছিলাম, "আমরা ভাটার টানে প্রায় ১৫-২০ মাইল নৌকা বেয়ে চলে এসেছি আর আশ্রয় নিয়েছি শুকপাড়া খালে"।

শুরুতেই আমাদের দলের লোকেরা পারে নেমে জঙ্গল পরিষ্কার করে, সেখানেই রান্নাবান্না করল, এ ছিল এক মহা বনভোজন। আর মাঝিরা পাহাড়ে উঠে সুন্দরী কাঠ কেটে কাঠের দোতলা করে দিল নৌকোতে। এর আগে নৌকায় ছিল বাঁশের চটার বেড়া। পারে উঠে দেখি আমার বন্ধুরা সতীশ, অতুল সবাই আছে, কিন্তু ওরা ছিল অন্য নৌকোতে। ওদের দেখে মনটা বেশ আনন্দিত হলো। আমার দিন তো

বেশ কাটছিল। আমাদের নৌকাগুলি রাতে চলত, আর দিনের বেলায় পাড়ে ভিড়ত, পাছে আবার মিলিটারিরা দেখতে না পায়। সরু খাল এর মধ্য দিয়ে সেই নৌকা চলত তাই কোনো বড় মিলিটারি লঞ্চ এই সরু খাড়ির মধ্যে আসতে পারত না। জঙ্গল পরিষ্কার করে আগে সেখানে কাউকে যেতে দেওয়া হতো না, কারণ ছিল বাঘের ভয়।

তাই প্রতিটি নৌপথে একজন করে ওঝা থাকতো তিনি গণ্ডি কেটে দিতেন মন্ত্র পড়ে যাতে বাঘ প্রবেশ করতে না পারে। তারপর সবাই নৌকা থেকে নেমে পড়তে বাবা কাকারা, তাস খেলতে আর আমরা গোল ফল খেতাম জঙ্গল থেকে।

আশ্বিন মাসের দুর্গা পুজো এভাবে নৌকাতেই কেটেছে আমাদের। সুন্দর হলেই আবার নৌকো ছাত্র আর আমরা ছোটরা বড়দের কাছে গল্প শুনতাম দেবী দুর্গার অসুর বধের কাহিনী, নানা রূপকথার গল্প, পরীর গল্প। এভাবেই নৌকোতে কেটেছিল সাত দিন সাত রাত। দিনের বেলায় যখন নৌকো ভিড়ত, দেখতাম হরিণের পাল জল খেতে এসেছে পাড়ে।শ'এ শ'এ হরিণের পাল, তাদের লম্বা লম্বা সিং। আবার দেখতাম বুনো শুয়োরের দলকে, আর দেখতাম বানরের দল আর মুরগিকে। এভাবে সাতদিন পর আমরা এসে পড়ি ভারতের সীমানায়, ভারতের ফরেস্ট আমরা আমাদের দেখে অভ্যর্থনা জানায় আর অভয় দিয়ে বলেন-আপনাদের আর কোন ভয় নেই। এই পথে যান। সূর্য কখন উদয় হয়েছে কেবল, আর আমাদের শুরু হলো এক নতুন পথ চলা।-আর সেইসঙ্গে আমাদের নতুন পরিচয় হলো উদ্বাস্তু।

ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

অর্পিতা দাস

৩য় সেমিষ্টার, বাংলা (সাম্মানিক)

পুরুলিয়া ভ্রমণ

সময়টা ছিল নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে এক বৃষ্টি ঝরা সকাল। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এক শনিবারের সকালে আমাদের গাড়ি ছুটে চলল পুরুলিয়ার পথে। পরিচিত গণ্ডির সীমানা ছাড়িয়ে একঘেয়েমি জীবন যাত্রাকে পিছনে ফেলে ছোট্ট একটা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আজ লিখছি। আমার আনন্দ অনুভূতিকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেব বলে। আমাদের গন্তব্য স্থল পুরুলিয়া বড়ন্তি, গড় পঞ্চকোট, তারপর মাইথন, কল্যানেশ্বরী হয়ে ছোট্ট চার দেয়ালের মধ্যে ফেরা। আমাদের সঙ্গে আছে অনেক খাবার-দাবার। সকালের হালকা টিফিনের মধ্যেই নেওয়া হয়েছিল পাউরুটি, পাকা কলা, ডিম সেদ্ধ, কেক, বিস্কুট, চিঁড়ে ভাজা, নিমকি ইত্যাদি। জলখাবার হিসেবে বানিয়ে নিয়েছি নুডুলস— সকলের প্রিয়। আর বর্ধমানের ঐতিহ্য হিসেবে বাঙালি আমরা মুড়ির কথা কীভাবে ভুলে যাই, সেটাও স্থান নিয়েছে আমাদের খাবারের ব্যাগে। কোথায় যাবো এই নিয়ে আমাদের ড্রাইভার রতনের সঙ্গে একটু আলোচনা করতে করতেই অনেকটা সময় কেটে গেল। এরপর একটু ফাঁকা জায়গা দেখে আমরা জল খাবারটা সারলাম। অবশ্য এর আগে কিছুটা হালকা টিফিন খাওয়া হয়ে গিয়েছে আমাদের। খাওয়ার পর্ব সেরে আবার আমরা যাত্রা শুরু করলাম। বৃষ্টি চলে যাওয়ার পর আমরা বুঝতে পারলাম আমরা রাস্তা ভুল করেছি। গাড়ি ছুটে চলল অচেনা রাস্তায়। রাস্তার দুধারে কোন জনবসতি চিহ্ন নেই, শুধু নাম-না-জানা গাছের জঙ্গল। একটু পরেই আমরা দেখলাম একটা জীর্ণ প্রাইমারি স্কুল। স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মহড়া দিচ্ছে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাদের প্রতিভা নিরীক্ষণ করার পর দুইজন শিক্ষিকাকে জিজ্ঞাসা করলাম বড়ন্তি যাওয়ার ঠিকানা। তাদের দেওয়ার নির্দেশ মত আবার আমাদের গাড়ি ছুটে চলল। আরও কিছুটা যাওয়ার পর দূরে দেখা দিল অস্পষ্ট গাছে ঘেরা একটা পাহাড়। আর সেইসঙ্গে স্বচ্ছ জলের একটি বৃহৎ জলাধার। আমাদের গন্তব্য স্থল বড়ন্তি পাহাড় এবং রামচন্দ্রপুর

বাঁধ। পাহাড়টা প্রথমে ছিল দিগন্ত রেখার কাছাকাছি। এখন অনেক কাছে, তার আসল সৌন্দর্য নিয়ে ধরা দিল আমাদের চোখে। পাহাড়টার একেবারে কাছেই আমাদের আজকের আশ্রয়স্থল মহুল বন রিসোর্ট। খুব সুন্দর আপ্যায়ন ওদের। আমরা একটু ফ্রেস হয়ে নিয়ে খেতে গেলাম। একতলার যে ঘরটিতে আমরা ছিলাম তার পাশেই পরিচ্ছন্ন ডাইনিং রুম। যত্ন করে পরিবেশিত হলো ছিমছাম ঘরোয়া খাবার। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকাল ৪ টা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়টাকে অনেক কাছ থেকে দেখলাম। গ্রামের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে আলাপ হলো গ্রামবাসী এক মহিলার সঙ্গে। অর্থের আড়ম্বর নেই, সাদাসিধা জীবনযাত্রা ওদের। ছেলেমেয়েরা অনেক প্রতিকূলতার সাথেও স্কুলের গন্ডি পেরিয়েও কলেজে পড়াশোনা করছে। অল্প চাষবাস, ছোটখাটো কিছু কাজ, ওতেই ওদের স্বল্প চাহিদা মিটে যায়। এরপর আমরা বাঁধের দিকে গেলাম আরও অনেকটা হেঁটে। প্রকৃতির কি অসীম মমতায় পাহাড় ঘেরা গ্রামটাকে সাজিয়ে দিয়েছে। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ আমাদের মতো শহরের মানুষকে আরও আপন করে নেয়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমরা ফিরে চললাম রিসর্টে। রিসর্টে গিয়ে চা, মুড়ি, চানাচুর ও পকোড়া খেলাম। সুন্দর চা করেছে ওরা আর পকোড়াটাও দারুণ। সান্ধ্যকালীন জলখাবার সেরে আবার আমরা বেরোলাম। রিসোর্ট থেকে একটু দূরেই একটা ধাপির উপরে বসে আছি। এমন সময় গ্রামের কয়েকজন মহিলা পুরুষ ওখান দিয়ে যেতে যেতেই আমাদের বললো আরেকটু রাত্রি হলেই ওখানে হায়না বেরোতে পারে। সেই কথা শুনে আমরা রিসোর্টে ফিরে এলাম। আমরা দশটার সময় রাতের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে স্নান সেরে লুচি, তরকারি ও ডিম সেদ্ধ দিয়ে জলখাবার খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বিদায় জানালাম আমাদের একরাত্রিরের আশ্রয়স্থল মহুলবন রিসোর্টকে। এবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো গড়পঞ্চকোটের দিকে। এবার আর ভুল হয়নি, আবার একটা পাহাড়। পাহাড়ের কোলে একটা মন্দির। এখানকার অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রচুর ভ্রমণপিপাসু মানুষ জমায়েত করেছে এই রবিবারের সকালে। গাড়ি গড়পঞ্চকোটে পৌঁছাতে দেখা গেল খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি শিল্পপ্রতিভার নিদর্শন হাতে ছোট ছোট অনেকগুলি ছেলেমেয়েকে। তারা স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা করে আর খেজুর পাতা দিয়ে ফুল তৈরি করে বিক্রি করে টুরিস্টদের কাছে। এই পয়সা দিয়ে কি করবে জিজ্ঞাসা করাতেই একজন বলল সে জামা কিনবে। আমাদের কাছে কিছু খাবার ছিল। কেক, বিস্কুট, চকলেট। আমরা ওদের দেওয়াতেই ওরা খুব খুশি হলো। ওদের খুশি আমাদের মন ছুঁয়ে গেল। দোকানিরা পসরা সাজিয়েছে সেখানে আড়ম্বরহীন শিল্প নৈপুণ্যের সম্ভার। বাঁশের বাঁশি থেকে শুরু করে ছৌ নৃত্যের মুখোশ কিছুই তাতে বাদ নেই। সামান্য কিছু কেনাকাটা করলাম। স্মৃতি হিসাবে রেখে দেবো বলে। ওখানে বসে আমরা দোকানে কুমড়ো ফুলের পকোড়া খেলাম। আর দেশি মুরগির মাংস রান্না করিয়ে প্যাক করে নিয়ে যাওয়া হল। মধ্যাহ্নকালীন ভোজনে খাওয়া হবে বলে। সময় অল্প তাই আমরা গড়পঞ্চকোটকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথে পাঞ্চেত বাঁধের কাছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ক্যামেরাবন্দি করা হলো। এরপর মাইথন ড্যামের কাছে আমরা আবার নামলাম। একটা নৌকা রাখা ছিল জলের মধ্যে, জলের মধ্যে নেমে আমরা ওই নৌকার পাশে যে গাছের তলায় বাঁধানো জায়গাটি ছিল সেখানে আমাদের অনেকগুলো ফটো তোলা হলো। মাইথনের পর কল্যাণেশ্বরী মন্দির দর্শন করে আমরা ওখানকার একটি হোটেলে মধ্যাহ্নকালীন ভোজন করলাম। তারপর আসানসোল পেরিয়ে গাড়ি দাঁড় করানো হলো ঘাগরপুরী মন্দিরে। এর আগেও আমি এখানে এসেছি তখন এখানে নির্জন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতো এই মন্দিরটি। এখন খুব জমজমাট। এবার ঘরে ফেরার পালা। ক্যামেরাবন্দি একরাশ স্মৃতি, আর মন ছুঁয়ে যাওয়া অনুভূতি সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম যে যার কর্ম জগতে। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং অনবদ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্মৃতি তুলে রাখলাম হৃদয়ের মনিকোঠায়।

অঞ্জনপ্রিয়া

অর্পিতা দেবনাথ
তৃতীয় সেমিষ্টার

সালটা ২০১৩,অনেকের কাছেই শুনেছি ১৩ সংখ্যাটা নাকি অশুভ হয়। আমার কাছে তো জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের সূচনা ১৩-এর হাত ধরেই। এবার বলি আমার জীবনে ১৩ সংখ্যার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ—

নয়ন,হ্যাঁ নয়ন। ওর সাথে আমার প্রথম পরিচয় আকাশকুসুম নামের এক নার্সারিতে। নার্সারিটি আমার দাদুর হওয়ায় প্রায়ই যেতাম সেখানে,আর নয়ন আসতো ফুলের মায়ায় ভাসতে। অল্প কিছুদিনেই আলাপচারিতা হলো শুরু,বহু বছর ধরে দেখার পর ও না জানা এমন অনেক ফুলের নাম নয়নই শেখালো আমায়। ও কতোকিছু জানে, এইটুকু বয়সে কতোকিছু করে ফেলেছে আয়ত্ব। নয়নের নয়ন দিয়ে আমি সব দেখবো এমনটা চাইতাম,তবে ওর মতো করে ভাবতে পারতাম না। বরাবরই আমার ভাবনাগুলি ছিল কৃত্রিমতায় ভরা,কংক্রিটের মেরুদন্ডের উপর দাড়িয়ে। আর নয়ন সে তো চিরকাল উদাসীন। বৈশাখের বিকালে দুজনে বকুল গাছতলায় বসতাম,নয়ন হঠাৎ বলতে শুরু করতো- আচ্ছা তুমি বটের পাখি দেখেছো কখোনো? যদিও এ জঙ্গলে নেই, বিহার,উত্তরপ্রদেশ,দিল্লি,পাঞ্জাবের মাঠে-ঘাটে-বনে-প্রান্তরে অনেক আছে। দেখলে মনে হয় তিতিরের বাচ্চা। এ প্রসঙ্গ শেষ না হয়তেই বলতো- তুমি কি জানো কাবুক কাকে বলে? হাতির দাঁতের ছোটোছোটো টুকরো দিয়ে বানানো পাখি রাখার ঘরকে কাবুক বলে। এমন সব কথা বলার মাঝে হঠাৎ আমায় ডেকে বলতো আচ্ছা অতিস, তুমি কখোনো চাঁদের জন্ম দেখেছো? কৃষ্ণপক্ষের শেষে প্রতিপদে নতুন চাঁদের জন্ম দেখেছো? আষাঢ়ের দিনগুলোতে বৃষ্টির পর কদম গাছের তলায় কদমের তীব্র সুরভি পেয়েছো কখোনো অতিস? মাথার মধ্যে স্নায়ুর জট পাকিয়ে যেতো বলতে পারতাম না কিছুই ।

শরতের শেষবিকেলে হঠাৎ একবার গাঢ় গোলাপি পাড় বসানো জলপাই রঙের শাড়ি,খোলা চুল,পায়ে নুপুর যেন এক আমৃত্যু যৌবনা এক রূপসী আমার জন্য একগোছা আবছা বেগুনি রঙের জারুল ফুল আর কি একটা যেন সোনালি-কমলা রঙের ফুল নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি শান্ত হয়ে জানতে চাইলাম ঐ যে ওটা কি ফুল নয়ন, ও হেসে বললো এটা অঞ্জনপ্রিয়া ফুল। অঞ্জনপ্রিয়া ! সেটা কি ফুল? না বুঝেই বলে ফেললাম আমি। তারপর আমার পারদর্শী নয়ন শরীরে মায়াতরুর মতো এক দোলা লাগিয়ে বললো- ওমা এ তো অশোক ফুল, অঞ্জনপ্রিয়াটা বহু পুরোনো নাম আমার ভালোলাগে তাই বললাম। এভাবে কেটেছে কত দিন, কত সন্ধ্যা করেছি পার,তেরোটি অমাবস্যা সাড়ে বারোটি পূর্ণিমা কাটিয়ে কৃত্রিমতা ছাড়িয়ে এক আধ্যাত্ম মায়ায় জড়িয়েছিলাম নয়নের সাথে। কখোনো আর পুরোনো সেই অতিসকে খুঁজে পায়নি,আমি হয়ে গেছিলাম নয়নের বিন্দু বিন্দু জমিয়ে সিন্ধু রূপে গড়ে তোলা অতিস।

সালটা ২০২১ এক নতুন শতাব্দীতে আমাদের শুভ পরিণয় হলো। এখন আর সেসব চাঁদের জন্ম,অঞ্জনপ্রিয়া ফুল দেখার অবসর নেই ঠিকই তবে সেই বহু পরিচিতা নয়ন প্রথমদিনের মতোই রয়ে গেছে একবিন্দু ফাঁকি নেই তার। সালটা এখন ২০২৫ নিয়মমাফিক অফিস থেকে ফিরে আজকাল স্বরে অ,স্বরে আ করেই কাঁটে। নয়ন যে আমার এখনো অটুট আজও সেই একই রকম অনন্যা। নয়ন আর আমার ছোট্ট এক রাজকন্যা, নয়নের দীপ্তি ওর চোখে মুখে তাই ওর নামকরণের দিন মুখে অনন্যা নামটাই এসেছিল। দীর্ঘ এই ১৩ বছরে বিচ্ছেদের,আক্ষেপের গন্ধ পর্যন্ত আসেনি আমাদের কাছে। তাই এই ১৩ সংখ্যাটিকে শুভ চিহ্নের শিলমোহর দিয়ে বরণ করে নিয়েছি। প্রতিটি সম্পর্কের নারী চরিত্রগুলি হোক এক একটি নয়ন, শুভ হোক আমার মতো তাদেরও সব গল্পকথন।

শুভবুদ্ধি সম্পন্না

পৌলোমী সেন
বাংলা বিভাগ

উত্তর কলকাতার মেয়ে কৌশিকী। বাবার চাকরিসূত্রে মুম্বাইতে সে বড় হয়েছে। সেখানে সে এক এনজিওর সাথে যুক্ত থেকে দুঃস্থ মানুষদের সেবা করত। সোশ্যাল মিডিয়ায় বর্ধমানের এক গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে অংশুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেই পরিচয় থেকেই তার বাবার সম্মতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অংশু মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। তাই তাকে কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো। আধুনিকা, বাবার আদুরে, স্বাধীনচেতা, মাতৃহীনা মেয়ে কৌশিকী ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে তার কর্মস্থলে না গিয়ে শ্বশুরবাড়ির সকলের সঙ্গে মানিয়ে গ্রামে থেকে পরিবারের সুখ পেতে চায়। শ্বশুর বাড়ির সবার মনের অমিল প্রচুর তবুও কৌশিকী চেষ্টা করে সকল কে মানিয়ে নিতে তা সত্বেও অবিবাহিতা পিসশাশুড়ি, শাশুড়ি ও বিধবা ননদের নানা কথার বজ্র বানে সে জর্জরিত হয়। মাতৃহীনা কৌশিকী ভালোবাসার এতই কাঙ্গাল যে শ্বশুরবাড়িতে ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কষ্ট করে হলেও জিন্স ছেড়ে শাড়ি পরে, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে গৃহস্থ বাড়ির সমস্ত কাজ করার চেষ্টা করে। এই ভাবে সে ধীরে ধীরে গৃহস্থবাড়ির যোগ্য বউ হওয়ার জন্য সবকিছু কাজ শিখে নেয়।

কৌশিকী ছোটবেলা থেকেই পথে ঘাটে চলা কোন দুস্থ মানুষকে দেখলেই কিছু না কিছু সাহায্য করতো। তাই অভ্যাসবশত একদিন ভরদুপুরে এক ভিখারি বাড়িতে আসায় সে ভিখারিকে কিছু টাকা, চাল জামা কাপড় দিলে বাড়ির সকলের কাছে তাকে অপমানজনক কথা শুনতে হয়। এমনকি পিসশাশুড়ি তাকে লক্ষীছাড়া বললেও সে যা করেছে ঠিকই করেছে ভাবে, তার মধ্যে কোনো অপরাধবোধ জাগে না। এরপর সে মনস্থির করে গ্রামের নতুন এনজিও খুলে দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াবে। তখন শাশুড়ি মা বলে 'বিটি না মাটি'। তিনি ভাবেন মেয়েরা মাটির মতো, তাই তার ছেলের বউকে যেমন ইচ্ছা করতে পারবেন, ঘরের বউ ঘরে থেকেই সংসার করবে। বাইরে ঘুরে ঘুরে এনজিওর কাজ করার দরকার নেই।

কয়েক মাস কৌশিকী সংসার করার পর একদিন দেখে শাশুড়ি মার হাত থেকে কাচের গ্লাস পড়ে ভেঙে যাওয়ায় রাগী শ্বশুরমশাই তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে, বাড়ির সবাই এমনকি তার নিজের মেয়েও দাঁড়িয়ে দেখছে তা দেখে কৌশিকী নির্ভয়ে শ্বশুরমশাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলে -"মা এমন কিছু অন্যায় করেনি, যাতে তাকে এত বকতে হবে।" কৌশিকির আধুনিক মনের জন্য এই প্রথম গর্ববোধ করে তার শাশুড়ি মা। যেখানে নিজের মেয়ে কোন কথা বলেনি সেখানে বৌমা তার পক্ষে কথা বলেছে। আবার একদিন হঠাৎ শ্বশুরমশাইয়ের গ্যাস্ট্রিক আলসারের পেটের যন্ত্রণা উঠলে বাড়িতে আর কোন ছেলে না থাকায় কৌশিকী তার স্বামী অংশুর মোটর সাইকেল নিজেই চালিয়ে শ্বশুর মশাইকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে। কয়েকদিন পর সুস্থ হয়ে শ্বশুরমশাই বাড়ি ফিরলে সে সকলের নয়নের মনি হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি তাদেরই প্রতিবেশী এক বিবাহিতা মহিলার হঠাৎ জ্বর, কাশি, খাওয়ায় অরুচি, বমি ভাব, মাথা ঘোরা সব রোগের উপসর্গ দেখা দিলে সকলেই তার সংসর্গ থেকে দূরে থাকতে চায় ও পাড়ার ছেলেরা প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে তাদের বাড়িতে ব্যারিকেড করে দেয়। তখন স্বাধীনচেতা, সাহসী, বিচক্ষণ কৌশিকী ভাবে এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই যে করনা হয়েছে তা নয়, তাই তাকে নিয়ে একাই সে সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষা করানোর জন্য নিয়ে যায়। পরে রিপোর্টে জানতে পারে মহিলার করণা পজিটিভ নয় বরং সে অন্তঃসত্ত্বা।

এই ভাবেই শাশুড়ি মার একটা কথাই যেন কৌশিকের বাঁচার রসদ হয়ে রইল 'বেটি না মাটি'। সত্যি মাটির তাল টাকে দিয়ে যেমন দেবী দুর্গার মূর্তি গড়া যায়, তেমনি গড়া যায় গৃহ লক্ষ্মীর মূর্তি। কারণ কৌশিকী তো দেবী দুর্গারই আরেক নাম। মেয়েরা যেমন দুর্গা রূপে অসুর নিধন করতে পারে তেমন ঘরনী হয়ে দশ হাতে সংসার সামলাতে পারে আবার সমাজ সেবার জন্য কোন দ্বিধা না করে এগিয়ে যেতেও পারে।

যুদ্ধ

মিজানুর মন্ডল
অশিক্ষক কর্মচারী, লাইব্রেরী

আজ যুদ্ধ সর্বক্ষেত্রেই সবার মধ্যে যুদ্ধ
ছাত্র থেকে যুব, বুড়ো থেকে খুড়ো সবার মধ্যে যুদ্ধ।
আপনি-আমি সকলেই এই যুদ্ধে বিদ্ধ
কারো যুদ্ধ ময়দানে অস্ত্রের ঝলকানিতে,
আবার শান্তি প্রিয় মানুষের যুদ্ধ অন্তরের ঘুলঘুলিতে।
যুদ্ধে সিদ্ধ জাতি আজি সবখানেতেই সিক্ত
আমরা সবাই মিলেই আছি আজি অসহায় রিক্ত।
তাই আজ নব কলেবরে যুদ্ধ এসেছে রাম রহিমের সঙ্গে -
যেখানে রাম পারে না রহিমের বাড়ির আচারে যোগ দিতে।
সেখানেই রহিম পারে না মুজাতবা আলীর মত জগন্নাথ দর্শাতে।
তবু আজও মানুষের মনে বেঁচে আছে মিলন মেলার দর্শন।
আবার যুদ্ধ প্রিয় মানুষের কাছে আছে অস্ত্রের গর্জন।
তারা মানে বা না মানে পরোয়া করে না মোদের ভারত দেশ
এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস মানব জাতি লইবে আবার আগের বেশ।

শুভ জন্মদিন

পিংকন বিশ্বাস
অতিথি অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান

আজকে তোমার জন্মদিন
শত রকম আয়োজন আজ
কেক পায়েস আর পোলাও মাংস
পুতুল আর খেলনা উড়োজাহাজ
অনেক শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদ
পিয়া সোনা যে কত পেল
নেই সীমানা সবার খুশির তাই
অনেক অতিথি এলো আর গেলো
কিন্তু শেষে একটি কাজেই
শুভ দিনটি আজ শুরু হলো
আশ্রমের শিশুরা এসে যখন
পিয়ার মুখে হাসি ফোটালো
শ্রেষ্ঠ উপহার পিয়া রানীর
ওই শিশুদের হাসি অমলিন
পিয়ার আশা সবাই সুখে থাক
কারণ আজ যে পিয়ার জন্মদিন।

না-বলা কথা

লোকনাথ সাহা
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ

কবেইবা বললাম, 'ভালোবাসি'?
বলিনি সত্যিই।
বলো নি তো তুমিও।
তবুও তো চলে নদী, সাগরের টানে।
তবুও তো ভাসে নৌকা, তীরের সন্ধানে...

ভালোবাসা কি বলেই হয়!!!
না-বলা কথাতেও রয়ে যায় অনেক সঞ্চয়...

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

বলরাম দাস
অশিক্ষক কর্মচারী

তুমি হলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
তোমার কাছে নেই কোন জাত পাত

তুমি হলে জমিদার বংশজাত,
কিন্তু হওনি জমিদারের মত

তুমি হলে মহান কবি তোমাকে জানাই প্রণাম,
তোমার কাছেই মানুষকে ভালবাসার
শিক্ষা পেলাম ।

লেখা আছে তোমার কত কবিতা আর গান
শুনে আমাদের মন করে দেয় ম্লান।

তোমার অনুপ্রেরণায় নরেন হল স্বামী বিবেকানন্দ,
ভারতবাসীকে দিল মন ভরা ভালবাসা আর আনন্দ

নাইট 'উপাধি' করলে ত্যাগ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যায়
তাইতো তুমি আজও বেঁচে আছ ভারতবাসীর আত্মায়

তোমার লেখার ভাষা মোদের বাঁচার আশা
শিখিয়েছে শুধু সকলকে ভালোবাসা

তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি অনন্য
তোমাকে পেয়ে আমাদের সকলের জীবন ধন্য।

স্বপ্ন সত্যি

নয়ন সাহা
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ (বি.এড)

অলীক স্বপ্ন সত্যি হয় না, এটাই নাকি দস্তুর।
উপর থেকে পড়বে গড়িয়ে, সেটাই ধর্ম বস্তুর।
তবু যদি কারো ছুঁড়ে দেওয়া ঢিল আকাশটা করে পার
স্বপ্ন সত্যি স্বপ্ন সত্যি আহ্লাদে একাকার।

লড়াই তোমার শেষ হবে না গো, জিতবে না কোনদিনও।
মাঝেমধ্যে যে তার মত ভান করে দিন গুণও।
তবুও যদি ঝলকায় অশী, শত্রুরা ছারখার
স্বপ্ন সত্যি স্বপ্ন সত্যি আহ্লাদে একাকার।

জীবন মানে ঋণের বোঝা, হিসেব সুদ আসল।
ভাবিস যদি সব মেটাবি, তাইলে তুই পাগল।
তবুও যদি জীবন খাতার অঙ্কে গোল্লা পাস
স্বপ্ন সত্যি স্বপ্ন সত্যি আহ্লাদে হাঁসফাঁস।

কোজাগরী

জয়িতা সুর
অতিথি অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

একথালা চাঁদ ঝাপসা লাগে৷ কে জাগে রে...
পিঙ্কিদিদিদের সরায় বসা লক্ষ্মী
আয় বাবু,দেখসো কাণ্ড, পিঙ্কি চোকলা ফেলসিলি!
শঙ্খ ঘণ্টা , উলু...মানা আয়...
নাড়ুমাখা গন্ধ ৷তারপর শ্যামাজেঠুর বাড়ি॥
নারকোল চিঁড়ের ভোগ ,ছাপা সন্দেশ আর জয়িতা আসবা কিন্তু,তোমারে তো দেখতেই পাইনা ॥
লুচি,সুজির সাথে ঘুগনি৷আরে আমার ডিপার্টমেন্ট৷তোর কাকিমা জানেনা!
এদিন আসবি,পরেরদিন তোদের বাড়ি যেতে হবে॥
সরা,খুঁচি,মূর্তি,ধান,চাঁদমালা জুড়ে আসলে খড়িমাটির গন্ধ,লুচি-খিচুড়ির সুবাস, কৌটোভরা অপেক্ষা,কাকা-ভাইঝি দোসর..
এ মানা বড়ো হয়ে গেলি!
ঠাকুর মানিনারে উৎসবটা মানি৷এই যে সবাই আসে ,আনন্দ করে এই তো পুজো॥
বড়ো হতে বিশ্রী লাগে৷আকাশে তাকাতে ভয়৷ একখানা গোল টিপ পড়া মুখ মনে পড়ে...'দেখো, কতদিন পরে বুড়ি এসেছে!'স্মৃতি ভার হয়ে আসে৷
একথালা চাঁদ ঝাপসা লাগে। কে জাগে রে!

নিঃশব্দ

লিপিকা বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

নিশুতি রাত শুনশান চারধার
একাকী পাঠ নিঃশব্দ শিশিরে
অজানা অচেনা বিশ্বের দরবারে
কি বা দিতে পারে।
তবু দেওয়া ও নেওয়ার হিসাব চলে
অবিরাম অনবরত।
চলতি পথের আড়াল করে রাখে যা
তা তো চরম উদাস বাউল বাতাস
সুর তোলা এক অচিন পাখি
গান শোনাতে চায়।
আবার যখন নতুন করে শুরু করা
না বলা গোপন কথা
নিঃশব্দে শোনাতে চায়
সব আছে এই বার্তা।
তখনই সব পেরিয়ে ফিরে আসে
সকালের রৌদ্র
তখন নিঃশব্দের ঘোর কেটে
দিনের আলো পথ দেখায়।

কিন্ডেল এর সাথে এখন সকলে মিঙ্গেল
তাই বইগুলো হয়েছে সিঙ্গেল

স্নিগ্ধা চক্রবর্তী, বি.এড

বর্তমানে বইয়ের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পেয়েছে কি না সেটি আলোচনার শীর্ষে। 'বই' কথাটি বলতে যা বুঝি কি আমরা তা হল, বই মানুষের মধ্যে যুক্তি-বুদ্ধির সঞ্চার ঘটায়, চিন্তাশীল করে তোলে, ভিতরের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে। চীনা প্রবাদ আছে, 'যে ব্যক্তি পরপর তিনদিন বই পাঠ থেকে বিরত থাকে সে তার কথা বলার সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে।' আলমারিতে সাজান বই যেমন পাঠকের রুচির ও শোভার পরিচয় দেয় তেমনই নতুন বইয়ের গন্ধ এক অনাবিল আনন্দ দান করে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি বই পড়ার অভ্যাস কমছে। বইগুলি এখন e-book এ বন্দি। বইয়ের বিক্রি বাড়াতে বইমেলাতে তাই লটারি সিস্টেম। বইয়ের অবমূল্যায়ন রোধ করতে বইমেলা যথেষ্ট নয়। গ্রন্থাগারের সংরক্ষণ দরকার। পাড়ার-মহল্লায় ক্লাব নয়, লাইব্রেরী চাই। শোপিস, ক্যাডবেরি না উপহার দিয়ে বই উপহার দেওয়া দরকার। প্রাণদায়ী বাস্তব এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছাপা বই কে সভ্যতা থেকে বিলুপ্ত করা যাবে না। টলস্টয় বলেন, মানুষের জীবনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বই, বই আর বই। তাই বই পাঠের অভ্যাস বাড়াতে হবে। সম্প্রতি সন্তোষপুর লেক পল্লীকে সঙ্গে নিয়ে অভিনব বইমেলার আয়োজন করেছিল, শিখনের বিনামূল্যে বই দেওয়া হচ্ছিল বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করার জন্য। বই পাঠ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে রেখে দিলে সনাতন সাহিত্যের অমরত্ব ঘটবে।

বিষয়: কল্পবিজ্ঞান

শমীক ঘোষাল
তৃতীয় বর্ষ, পদার্থবিদ্যা (অনার্স)

সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাড়ির সামনের মাঠে একটু জগিং আর ওনার বয়সী লোকেদের সাথে আজকালের ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে আড্ডার পালা শেষ করে, বাড়ি ফিরে নিজের শখের ফুলের বাগানে জল দিয়ে সকাল শুরু হয়,সদা মুখে হাঁসি লেগে থাকা,পেশায় পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসার দে বাবুর।রিটায়ার্ড করার বয়স যত কাছে আসছে,ওনার কলেজের প্রতি টান আর ওনার ছাত্রদের প্রতি ভালোবাসাও দিন দিন সমানুপাতের সূত্রপথ ধরে বেড়েই চলেছে।কিন্তু বেশ কয়েকদিন হয়ে গেলো,কলেজে যাওয়া নেই,ছাত্র-ছাত্রীদের দেখা পাওয়া নেই,সকালের জগিং, আড্ডা কিছুই নেই দে বাবুর ডেইলি রুটিনে। মাঝে মাঝে বাজারে গেলে দেখা মেলে নিজের মতোই সাদা পোশাকে আপাদমস্তক মোড়া লোকজনের,যাদের বাইরে থেকে চেনার বিন্দুমাত্র উপায় নেই!

হ্যাঁ করোনা নিয়ে দেশের প্রতিটি নাগরিক সচেতন,ভাইরাসটার দৌরাত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে।আজও বাজার থেকে এসে সাদা পোশাক খুলে,সেটাকে স্যানিটাইজেশন করে হাতে মুখে সাবান দিয়ে ঘরে ঢুকে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।সকালের খাবার শেষ করে আর ট্রেন ধরার তাড়া নেই,নেই সঠিক সময় কলেজে পৌছানোর ব্যস্ততা!অগত্যা ঘরের প্রিয় আরামকেদারায় বসে মাথার উপর সিলিং এ ঘুরে চলা ফ্যানের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ও ভাবছেন কত মানুষ ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে,কাজ হারাচ্ছেন কত লোক,আর আক্রান্ত মানুষের কথা তো বলাই বাহুল্য!

হটাৎ এক চাপা চিৎকার দে বাবুর গলায়।তিনি হটাৎ কোথা থেকে যেনো পরে গেলেন।তার সামনে এখন বিশাল এক

দরজা।অজানাকে জানার কৌতুহলের কাছে পরাজিত হয়ে দে বাবু খুললেন তার সামনের সেই দরজাটি।তিনি দেখলেন হাতে গোনা কয়েকজনই রয়েছে সেখানে,কি যেনো বানাচ্ছেন তারা।অদ্ভুত ব্যাপার,তাদের সবার চোখে নীল রঙের চশমা।নাঃ সানগ্লাস নয়,তবে আধুনিক সানগ্লাস হতেই পারে!দে বাবুর বুঝতে বাকি রইল না তিনি ভাগ্যের পরিহাসে হঠাৎই উপস্থিত হয়েছেন অন্য এক জগৎ এ! কিন্তু ওরা কি বানাচ্ছে,সেই দেখার উৎসাহে একটু এগিয়ে যেতেই,তার কাঁধে এক নরম হাতের ছোয়া লাগল! হটাৎ করেই কপাল ঘেমে গিয়ে কণ্ঠস্বর সরু ও কেঁপে গিয়ে দে বাবু বললেন-"আমি কিছু করিনি স্যার,হঠাৎই হারিয়ে গিয়ে এখানে এসে পড়েছি!"

"আপনি কিছু করবেন কেন,আপনাকে তো আমাদের রাজা ডেকে পাঠিয়েছেন বলেই আনা হয়েছে"- বললেন সবুজ চেহারার নীল চশমা পরা জিডুং।রাজার কাছে যেতেই রাজামশাই দে বাবুকে বললেন-" কি দে বাবু নাভিশ্বাস লাগছে জীবনটা?"

—বিশ্বাস করুন আমি আমার জীবন দশায় কখনো মহামারী দেখিনি। গল্প,উপন্যাসে পড়েছি বটে!কিন্তু বাস্তবের মাটিতে সে যে কি ভয়ঙ্কর তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি!

—ঠিকই বলেছেন।ওই দেখুন ওদিকে ওই ভাইরাস বানানোই হচ্ছে!আর এগুলো বানিয়ে পৃথিবীর দিকে পাঠানো হচ্ছে!

—সে কি! একি করছেন আপনারা!আপনারা কারা? কেনো করছেন এসব? কি ক্ষতি করেছি আপনাদের আমরা,পৃথিবীর মানুষেরা?

—ভয় নেই এখানে আপনি আক্রান্ত হবেন না!এটা নেপচুন।পৃথিবী নয়!

—কিন্তু পৃথিবীর নিরীহ মানুষরা?ওদের কি দোষ ওরা তো অর্ধেক করোনার থাবায় আর বাকি অর্ধেক কাজ হারিয়ে না খেতে পেয়ে মারা যাবে।আপনি প্লিজ এই ভাইরাস বানানো বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

একটু রেগে গিয়েই রাজা মশাই বললেন— "দেখুন আপনারা,মানে মানুষেরা প্লাস্টিকের ব্যবহার ইদানিং যে হারে বাড়িয়েছেন,আর তা ব্যবহারের পর যে ভাবে এদিকে ওদিকে ছড়াচ্ছেন,আমাদের সেজদা পৃথিবীর খুবই খারাপ অবস্থা,গ্লোবালওয়ার্মিং হচ্ছে সেজদার বুকে,তার জামা,ওজনস্তরও আজ ছিড়ে গেছে। যার বুকে বাস করছেন তাকেই দিন দিন নোঙরা করছেন! আমি ভাই হিসেবে দাদার উপর এই অত্যাচার মানি কি করে বলুন? তাই এই পদ্ধতিই বাছলম,কেবলমাত্র আপনাদেরকে প্লাস্টিকে মুড়ে দেবো বলে!বুঝুন আপনারা,প্লাস্টিকে মুড়ে থাকা কতটা কষ্টকর!"

লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার মতো অবস্থার সম্মুখীন হয়েও দে বাবুর মাথায় শুধু একটা কথাই কাজ করছে এই ভাইরাস থেকে মানুষেদের বাঁচাতে হবে। তিনি বললেন— "দেখুন যা হয়েছে তা খুবই অন্যায়,এমতাবস্থায় আমারও কিছু বলার নেই,তবে আপনার কথা মাথায় রাখব রাজা মশাই। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো ও যেটুকু ব্যবহার হয় তা যেখানে সেখানে না ফেলে রি-সাইকেলিং এর ব্যবস্থা আমরা করবো। আর গ্লোবালওয়ার্মিং থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য গাছ লাগানো চলছে,সেটার হার আরো বাড়াবো।আপনি প্লিজ এই ভাইরাস বানানো বন্ধ করুন!"

—আপনিই বলেন, মানুষকে প্লাস্টিকে মুড়ে দেওয়ার জন্য দূষণের মাত্রা কতটা কমেছে আমার দাদার বুকে।ওজনস্তরের ছিড়ে যাওয়া অংশও আজ জুড়ে যাচ্ছে। তার পরও আমি দাদার ভালো হওয়া আটকাবো?

—আপনি প্লিজ এই ভাইরাস বানানো বন্ধ করেন,নতুবা মানুষের অস্তিত্বই থাকবেনা পৃথিবীতে।মানুষ অনেক বড় শিক্ষা পেয়েছে।আর ভুল করবেনা সে!

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, অনেকটাই শিক্ষা দেওয়া গেছে,তবে একটা ঘটনা ঘটে গেছে,যার কারনে করোনা ভাইরাস তৈরি করার ম্যাশিন বন্ধ করা যাচ্ছেনা!

—সর্বনাশ! তাহলে এখন উপায়?

—উপায় অবশ্য আছে।আপনাকে এই 'চিপ সেট' টা দিচ্ছি।এটি আপনি আপনার ল্যাবের কম্পিউটারে ঢুকালেই হোয়াইট হোল থেকে একটি রে পৃথিবীর দিকে যাবে যা ধ্বংস করে দেবে সমস্ত ভাইরাস!

—দিন আমাকে তাহলে,আমি কথা দিচ্ছি সমগ্র মানবজাতির পক্ষ হয়ে, আপনার সেজদাকে আবার আগের মতো সুস্থ করে তুলবো। কিন্তু ভাইরাস যে আর পৃথিবীতে নেই বুঝবো কি করে? চোখে তো দেখা যায় না!

রাজা মশাই হাঁসতে হাঁসতে দে বাবুকে ওই 'চিপ সেট' আর একটি চশমা দিলেন।ওই নীল চশমা। বললেন " এই চশমা পড়লেই ভাইরাসটিকে দেখতে পাবেন। আর ওই রে টিকেও।

এরপর হঠাৎ আবার অন্ধকার,গলা শুনলেন তার মেয়ে তাকে বাবা বলে ডাকছেন।হটাৎ দে বাবু দেখলেন তিনি চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে আছেন,আর বাইরের সমস্তকিছুই সেই আগের মতো! করোণা ভাইরাস ও লকডাউনের পরিচিতি দিন! হঠাৎ চোখ কপালে উঠে গেলো দে বাবুর যখন নিজের বিছানায় দেখলেন সেই 'চিপ সেট' আর চশমা! তরিঘরি করে নিজের ফোর হুইলারে করে গেলেন কলেজে,সেখানে তার নিজের ল্যাব ও কম্পিউটার আছে। নীল চশমাটা চোখে দিয়েই চিপ সেটটা ঢোকালেন তার কম্পিউটারে। অবাক ভাবে ল্যাবের জানালা দিয়ে দেখলেন এক অতি উজ্জল রে আসছে পৃথিবীর দিকে যা ধীরে ধীরে ধ্বংস করছে সমস্ত করোনা ভাইরাস! দে বাবুর মুখের হাসিটা যেনো আরো চওড়া হয়ে গেলো!

পরদিন, টিভিতে সম্প্রচারিত হলো,করোনা ভাইরাস থেকে পৃথিবী মুক্ত। লকডাউন উঠলো ও মানবজাতি ফেললো স্বস্তির নিঃশ্বাস! কলেজে গেলেন দে বাবু। তবে ফিজিক্সের বদলে তার গলায় শুধুই প্লাস্টিক মুক্ত পৃথিবী,সবুজে ভরা পৃথিবী গড়ার ডাক। "গাছ লাগান,প্রাণ বাঁচান" ,"এসো আমরা শপথ করি,প্লাস্টিক মুক্ত পৃথিবী গড়ি" প্ল্যাকার্ডে ভরে গেলো কলেজ চত্তর।এই ক্যাম্পেনই যে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে তাকে!তাহলেই তো আর কোন ভাইরাস তৈরি করে পৃথিবীতে পাঠাবেনা তার অন্যান্য ভাইয়েরা বা দাদারা!

"আমিই আমার গল্পের নায়িকা"

অঙ্কিতা সাহা
তৃতীয় সেমিস্টার, বাংলা (অনার্স)

ছোটোবেলা থেকেই লেখালেখি টা একপ্রকার আমার শখ কিন্তু সেই শখ কখন পেশায় পরিণত হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। না আমি কোনো বড় লেখিকা নই প্রোডাকশন হাউজে স্ক্রিপ্ট রাইটার।কিন্তু কখনো সেভাবে কেউ কদর দেয় না এটা নিয়ে প্রথম প্রথম কষ্ট হলেও এখন সহ্য হয়ে গেছে যায় হোক আমি মিলি...মিলি বসু।

মিলি..... ওই যে ডাক পড়লো...

মিলি—হ্যাঁ স্যার যাচ্ছি...

স্যার— কি ব্যাপার কি কখন থেকে নায়ক মেকআপ রুম বসে আছে আর তুমি তাকে স্ক্রিপ্ট দাওনি !!

মিলি— সরি... বলেই একছুটে গিয়ে মেকআপ রুমে উপস্থিত হল আর একটা গম্ভীর গলার আওয়াজ...

...কি ব্যাপার কি তোমার জন্য কি এখন আমায় অপেক্ষা করতে হবে নাকি? ষ্টুপিড....

কি আর করব চুপচাপ বেরিয়ে আসলাম কিছুই যে বলার নেই আমার কারণ আগেই বলেছি আমার লেখালেখি নিয়ে আমি খুশি হলেও সেই সম্মান টা আমি পাই না...

এই সব ভাবতে ভাবতে মিলি বাড়ির পথে রওনা দেই...

সকাল ৮টা হঠাৎ মিলির ফোন টা বেজে উঠলো ঘুম জড়ানো কণ্ঠে মিলি বললো

—হ্যালো

—ওপাশে- মিলি বসু বলছেন...

—হ্যাঁ বলেছি...

—আমি অভিরাজ প্রোডাকশন থেকে বলছি

—এক নিমেষে যেনো মিলি এর ঘুম চলে গেলো

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন

—অভিরাজ সেন আজকে সকাল ৯টায় আপনাকে দেখা করতে বলেছে।

—ওকে আমি যাব...হঠাৎ কোনো অজানা কারণে মিলির মন টা খুশি হয়ে গেলো...

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে মিলি পৌঁছে গেলো সেখানে...

একটি মেয়ে কে দেখে মিলি ডাকল "এক্সকিউজ মি মিস্টার অভিরাজ সেন আছে?"

—"আপনি কি মিলি বসু?"

—হ্যাঁ স্যার ওনার কেবিনে আছেন... ওই যে ওই টা স্যার এর কেবিন আপনি যেতে পারেন...

"ধন্যবাদ" মেয়েটিকে ছোট্ট করে উত্তর দিয়ে এগিয়ে গেলো মিলি।

—হ্যালো স্যার আমি মিলি বসু আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন।

—হ্যাঁ বসো আমার তোমার লেখা গল্পটা পছন্দ হয়েছে আমি ওটা নিয়ে কাজ করব কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে... দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন অভিরাজ বাবু।

—কী শর্ত স্যার? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো মিলি।

—নায়িকা এর চরিত্রে তোমাকে অভিনয় করতে হবে।

আমি!!! তবুও নিজেকে কিছু টা সামলে নিয়ে মিলি বললো আমার দ্বারা হবে না স্যার ,আমার নায়িকা হবার মত কিছু নেই...তারপর সারারাত জেগে গল্প লেখার কারণ হিসাবে চোখের নিচে এই কালি—একটা তাচ্ছিল্যের হাসি মিলি এর মুখে

"কিন্তু তোমার গল্পের যে মেয়ে টার বর্ননা তুমি দিয়েছো তাতে তোমার সাথেই মেলে চুল হাসি সব কিছুই..." অভিরাজ বাবু বলে উঠলেন।

"হ্যাঁ ওই আর কি নিজেকে নিয়ে ভেবে লিখলে সুবিধা হয় আর কি"—লজ্জিত ভাবে উত্তর দিলো মিলি।

"আচ্ছা তাই যদি হয় তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি..." অভিরাজ বাবু বললেন

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা...

সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে অভিরাজ বাবুই স্নেহের স্বরে বলে উঠলেন— "তুমি পারবে মিলি। তুমিই হবে তোমার গল্পের নায়িকা"..."আমি আমার গল্পের নায়িকা"... কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে উঠলো মিলি।

আত্মহত্যার সুপারি

গল্প - প্রবাল কুমার বসু

নাট্যরূপ - জয়ন্ত মুখার্জী

ল্যাব এটেনডেন্ট (পদার্থ বিদ্যা)

(চরিত্র - বড়বাবু, মেজবাবু, রতিকান্ত, ছট্টিলাল)

(প্রথমে একটি গাড়ি এক্সিডেন্ট—এর আওয়াজ শোনা যায়)(একটি থানা। দুই পুলিশ অফিসার কথা বলছেন।)

বড়বাবু: লোকটাকে কি অ্যারেস্ট করা হয়েছে মি. বোস?

মেজবাবু: না স্যার। প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়েছে বলেছি। অ্যারেস্ট ওয়ারান্ট কি তৈরি করব?

বড়বাবু: না, এখনই দরকার নেই। আগে ইন্টারোগেট করে দেখা যাক।

মেজবাবু: হ্যাঁ স্যার। আমারও তাই মনে হয়।

বড়: লোকটাকে নিয়ে খুব মুশকিলে পড়ে গেল মি. বোস। ভেবে দেখুন বনেদি বাড়ির ছেলে, শিক্ষিত। তার উপরে টিভি সিরিয়াল অভিনেতা, একা একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকে।

মেজ: হ্যাঁ স্যার। ওনার স্ত্রী কয়েক মাস হল ওনাকে ছেড়ে আলাদা থাকেন। ওনার স্ত্রীও একজন টিভি সিরিয়াল অভিনেত্রী।

বড়: হুম। পড়শীদের বক্তব্য অনুযায়ী নিরীহ, নির্ঝঞ্ঝাট, পরোপকারী এবং মিশুকে। এহেন ব্যক্তি, খামোকা খুন করতে যাবেন কেন?

মেজ: খুন করেননি স্যার। খুনের চেষ্টা। এটেম্ট টু মার্ডার।

বড়: ওই হল। আচ্ছা যেই লোকটিকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে তার কোন ট্রেস পাওয়া গেছে?

মেজ: না স্যার। তবে খুব তাড়াতাড়ি-ই পেয়ে যাব আশা করছি

বড়: ওকে। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার আগে পুরো ব্যাপারটা আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

মেজ: ইয়েস স্যার। ঘটনার সূত্রপাত সপ্তাহ খানেক আগে সকাল ছটা নাগাদ। ম্যাটাডোর তীব্রগতিতে এসে ধাক্কা মারে ফুটপাতের ওপর ওই হনুমান মন্দিরটায়। মন্দিরের একটা দিক ভেঙে যায়, মূর্তিটা উল্টে পড়ে। ড্রাইভার ম্যাটাডোরটাকে ব্যাক করিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

বড়: তারপর?

মেজ: কিছু প্রাতঃভ্রমণকারী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী, ওই সময় কেউ একজন মন্দিরে প্রণাম করছিল। ম্যাটাডোরটা তখনই সেই দিকে ধেয়ে আসে। এটা কোন কো-ইন্সিডেন্ট নয়। প্রণামরত ঐ ভদ্রলোককে আঘাত করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। ভদ্রলোক দ্রুত সরে যাওয়ায় এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান।

বড়: সে তো বুঝলাম। কিন্তু এই লোকটার সঙ্গে কানেকশনটা কোথায়?

মেজ: প্রাতঃভ্রমণ কারীদের কাছ থেকেই বয়ান নিয়ে ওই ম্যাটাডোরটাকে আইডেন্টিফাই করি এবং ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করি। ড্রাইভারকে জেরা করে গোপাল নামে একজনের সন্ধান পাওয়া যায়। তার স্বীকারোক্তির সূত্র ধরে এই রতিকান্তকে নিয়ে আসা।

বড়: আই সি। চলুন, ওনাকে এবার একটু বাজিয়ে দেখা যাক।

মেজ: চলুন। (মিউজিক)

বড়: মিস্টার রতিকান্ত চৌধুরী, আপনি কি জানেন, আপনাকে কেন এই পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসা হয়েছে?

রতিকান্ত: আজ্ঞে না। সকালে হঠাৎ পুলিশের ডাকে ঘুম ভেঙে যায়। দরজা খুলি। শুনলাম কাউকে নাকি খুন করার অভিযোগে আমায় থানায় যেতে হবে। কিন্তু আমি তো কোন খুন করিনি।

মেজ: না, খুন করেননি, খুনের চেষ্টা করেছিলেন।

রতিকান্ত: কিন্তু কাকে?

বড়: একজন ভদ্রলোককে। যিনি ভোর বেলায় মর্নিং ওয়াকে যাবার সময় হনুমান মন্দিরে পুজো করেছিলেন, তাকে।

রতিকান্ত: কবে?

মেজ: লাস্ট উইক, সোমবার।

রতিকান্ত: (একটু চুপ) ওঃ ঐ দিন, ঐ দিন সকাল পাঁচটা নাগাদ তো পুজোটা আমিই করছিলাম। ম্যাটাডোরটাকে ওইভাবে আসতে দেখে দ্রুত সরে গিয়েছিলাম।

মেজ: আপনাকে দেখে যতটা সহজ মনে হয়েছিল, আপনিতো ততটা সহজ নয় রতিকান্ত? (গভীর হয়ে) গোপালকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। সে তার বয়ানে স্বীকার করেছে, যে তাকে খুনের জন্য সুপারি দেওয়া হয়েছিল। আর যে ফোন থেকে এই বিষয়ক কথাবার্তা হয়েছিল সেটা আপনারই ফোন নাম্বার, মিস্টার রতিকান্ত। এবার বাকি কথাটা আপনিই বলবেন।

রতিকান্ত: আপনি আমার কথাটা বিশ্বাস করুন।

মেজ: আপনার ফোন কি অন্য কেউ ব্যবহার করে?

রতিকান্ত: না তো।

মেজ: তাহলে আপনারই ফোন থেকে, কাউকে খুন করার সুপারি দেওয়া হল, আর সেটা আপনাকেই খুন করার জন্য? পুলিশকে আপনি কি মনে করেন? বোকা? আপনার এই কথা আমরা বিশ্বাস করব?

রতিকান্ত: (গম্ভীর হয়ে) দেখুন, বিশ্বাস করা, না করাটা আপনাদের ব্যাপার। কিন্তু আসল ঘটনা হলো আমার মধ্যে আসলে দুটো আমি আছে। একটা আমি, যে খুনের জন্য বরাত দিয়েছিল। আর অন্য আমি যাকে খুন করার জন্য বরাত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বরাত জোরে বেঁচে যাই।

বড়: (ধমক দিয়ে) দেখুন বেশি ফিলোজফি আওড়াবেন না। আমাদের ভুল পথে চালনা করার চেষ্টা করলে, সোজা ঢুকিয়ে দেবো।

মেজ: (একটু শান্তভাবে) দেখুন, আপনিতো সমাজে একজন রেসপেক্টেড পার্সন। এই সমস্ত জঘন্য কাজে জড়ালেন কেন বলুন তো? (ইতিমধ্যে বড়বাবুর ফোন আসে। ফোনের রিং শোনা যায়।)

বড়: হ্যালো? হ্যাঁ বলছি। ও ইয়েস। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওকে। থ্যাঙ্ক ইউ।

রতিকান্ত: (আত্মবিশ্বাসের সাথে) আমি কাউকে খুন করিনি। এমনকি অন্য কাউকে খুনের চেষ্টাও করিনি। একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন, যাকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল, সেটা অন্য কেউ নয়। বরং আমি নিজে।

মেজ: আর বরাত দেওয়া ফোনটা?

রতিকান্ত: হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। যে ফোন থেকে খুনের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল, সেটা আমারই। আমিই আমাকে খুন করার জন্য কন্ট্রাক্ট দিয়েছিলাম। (ইকো ২ বার)

বড়: উনি ঠিকই বলেছেন মেজবাবু। ইনভেস্টিগেশনের মেসেজটা এই মাত্রই পেলাম। সেদিন মন্দিরে উনিই পুজো করছিলেন আশ্চর্যজনক ঘটনা। আমার এতদিনের চাকরি জীবনে এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম ঘটল। নিজেকেই নিজে খুন করার জন্য কন্ট্রাক্ট দেওয়া, মানে আত্মহত্যার জন্য সুপারি? আচ্ছা কি কি ঘটনা খুলে বলুন তো মিস্টার রতিকান্ত।

রতিকান্ত: আসলে এই জীবন আমার আর ভালো লাগছিলো না। একটা ডোবার মধ্যে পড়ে সাঁতার কাটার মতন জীবন।

কোন বৈচিত্র্য নেই, হেলদোল নেই, সামনে তাকানোর মতন কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই।

মেজ: আপনিতো একজন টিভি সিরিয়ালের অভিনেতা। মোটামুটি ভালই নাম করেছেন এই দুনিয়ায়। তবে?

রতিকান্ত: হ্যাঁ, ঠিকই। খুব কষ্ট করেই এখানে আমি পৌঁছেছি। প্রথমদিকে খুব ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করেই আমার চলত। পরে আমার ব্রেক থ্রু আসে রাজা হরিশচন্দ্র সিরিয়ালটা দিয়ে ওটার কাজ করে আমি খুব জনপ্রিয় হই।

বড়: হুম তারপর?

রতিকান্ত: এটা, এ ইন্ডাস্ট্রির কিছু উঁচু মাথার মানুষের যথারীতি পছন্দ হলো না। একটা গ্রুপ উঠে-পড়ে লাগলো যাতে আমাকে টেনে নামানো যায়।

মেজ: কেন?

রতিকান্ত: বাঃ তাদের জায়গাটা টলে যেতে পারে না! শুরু হলো আমাকে নিয়ে বিভিন্ন বাজে বাজে ট্রোল! বিভিন্ন পাবলিক অনুষ্ঠানে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করা, অপদস্ত করা।

মেজ: হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমি এইরকম একটা অনুষ্ঠান দেখেছিলাম, 'শরবত—খুবসুরত' না কি যেন। কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম এটা গট আপ। যেমন হয় আর কি। আপনার সম্মতি ছিল।

রতিকান্ত: (আলত একটু হেসে) ইতিমধ্যে আমি তৃষ্ণা কে বিয়ে করে কলকাতায় এসে এই ফ্ল্যাট—এ উঠি।

বড়: তার পরিচয় কি? মানে কোথায় থাকতেন তিনি বিয়ের আগে?

রতিকান্ত: (মৃদু হাসে) নাম তৃষ্ণা। মিডিয়ায় ওর নাম এখন চন্দ্রাবলী। ঠাকুরবাড়ির রূপকথা সিরিয়ালের উদয়িনীর চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছেন।

মেজ: হ্যাঁ হ্যাঁ। গিন্নির মুখে তো প্রায়ই শুনি ওনার কথা। ভীষণ সুন্দরী এবং জনপ্রিয়। উনিই আপনার স্ত্রী? আশ্চর্য!

বড়: আপনাদের যোগাযোগ হলো কি করে?

রতিকান্ত: আমি প্রথম যে গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করতাম, তৃষ্ণাও করতো। আমি তখন বেশ পরিচিত এবং জনপ্রিয় স্টারও বলা যায়। আর তাছাড়া তৃষ্ণা খুবই সুন্দরী, আকর্ষণীয়। হঠাৎ বিয়ে করে বসলাম।

মেজ: তারমানে আপনাদের বিয়ের আগে আপনার স্ত্রী সিরিয়ালে অভিনয় করতেন না?

রতিকান্ত: না। বিয়ের পর তৃষ্ণা সিরিয়ালে অভিনয় করবে বলে খুব বায়না করত। সত্যি বলতে প্রথমদিকে এসব নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবিওনি। কিন্তু হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল। একটা নামী চ্যানেলে, নামী প্রোডাকশনের আন্ডারে। মেগা সিরিয়ালের জন্য নায়িকা দরকার ছিল। আমি তৃষ্ণাকে সেখানে যোগাযোগ করাই। আর কী আশ্চর্য, চান্সও পেয়ে যায়। একচুয়ালি আমার ইনফ্লুয়েন্সেই কাজটা হয়।

বড়: ভালো তো। কিন্তু তাতে কি হল?

রতিকান্ত: এটাও এই ইন্ডাস্ট্রির আরও বেশকিছু কেউকেটা মানুষের চক্ষুশূল হয়ে উঠলো। অনেকটা ওই মেগাসিরিয়ালের গল্পগুলোর মতই আমার আর তৃষ্ণার মধ্যে ভাঙন ধরানোর জন্য খেলা শুরু হল। আবার অন্যদিকে আমি যাতে আর কাজ না পাই তার ষড়যন্ত্রও শুরু হলো।

মেজ: কি করে?

রতিকান্ত: আপনারা এই ইন্ডাস্ট্রির সম্পর্কে বাইরে থেকে কিছুই ভাবতে পারবেন না, ভিতরে আসলে কি অভিনয় ক্রমাগত চলতে থাকে। এই ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের পায়ের শক্তভাবে দাঁড়াতে গেলে একজন গডফাদার লাগে। যেটা আমার ছিল না। ভেবেছিলাম আমি আমার অভিনয় প্রতিভার জোরে সব বাধা টপকে যাবো। (দীর্ঘশ্বাস) কিন্তু তা আর হলো না। আমি কাজ হারাতে থাকি। এদিকে তৃষ্ণাও আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আমি এক ঘরে হয়ে পড়ি।

বড়: আপনি বোঝানোর চেষ্টা করেননি।

রতিকান্ত: তৃষ্ণা এবং তার সিরিয়াল এখন বিনোদন জগতে ১নং স্থানে। আর আমি পড়তি। কাজ না পাওয়া এক অতীত অভিনেতা। তবে তৃষ্ণাকে আমি পুরোপুরি দোষ দেবো না।

মেজ: কেন?

রতিকান্ত: সে এই ইন্ডাস্ট্রিতে নবাগতা। মানুষকে কিভাবে হ্যান্ডেলিং করতে হয় জানে না। সে বুঝতে পারছে না, তাকে কীভাবে মুনাফার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিফল হলাম। সে ভাবল আমি বোধহয় তার জনপ্রিয়তাকে হিংসা করছি। অথচ সে বেমালুম ভুলে গেছে, যে তাকে আমিই একদিন ভালোবেসে এই রূপালি জগতে প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছিলাম।

মেজ: তারমানে শেষ পর্যন্ত আপনার স্ত্রী আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

রতিকান্ত: মানুষ হঠাৎ যদি অর্থ, গ্ল্যামার আর খ্যাতি হাতের মুঠোয় পেয়ে যায়, তখন তার সেই মুঠো খুলে দেখতে ইচ্ছে করে না, যে সেই হাত একদিন কে ধরে তাকে এখানে তুলেছে। আমার জমানো সমস্ত অর্থ এমনকি বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্ট করার সমস্ত টাকাকড়ি নিজের নামে করে নিয়ে সে এখন আলাদা বাড়িতে থাকে। আর আমি হয়ে গেলাম প্রায় নিঃস্ব, অসহায়, অসম্বল।

বড়: ও, আর এই জন্য আপনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন?

রতিকান্ত: না, তা ঠিক নয়, আমার বিশ্বাস ছিল একদিন তৃষ্ণা তার ভুল বুঝতে পারবে।

মেজ: তাহলে? আপনি এত বড় সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?

রতিকান্ত: ঠিক এই সময়েই এল জীবানু আতঙ্ক। লকডাউন। অন্য সবকিছুর মতোই বন্ধ হয়ে গেল বিনোদন। থিয়েটার করে আমার চলছিল। সেটাও এখন এমন অনিশ্চিত হয়ে পড়ল যে (একটু চুপ) সঞ্চিত যা ছিল, শেষ হলো এক সময়। হাত পাতব? ভিক্ষা নেব? কিন্তু কোথায়? কার কাছে? আর তাছাড়া সে মানসিকতা গড়ে তুলতে অক্ষম হলাম। পারলাম না কারো কাছে হাত পাততে।

বড়: ও তার মানে আপনি সংসারী এবং অর্থনৈতিক দুইভাবেই বিপর্যস্ত ছিলেন।

রতিকান্ত: হ্যাঁ, আর তাই আমি ঠিক করলাম আর বাঁচবো না। জীবনের ওপর ঘৃণা চেপে বসলো। কিন্তু আত্মহত্যাও করতে পারলাম না। আত্মহত্যাকে আমি ঘৃণা করি। তাহলে? কি করব? কেমন ভাবে মারবো? ভাবতে ভাবতে গোপালকে কন্টাক্ট করি আমাকে মারার জন্য।

বড়: গোপাল কি জানত, যে আপনিই আপনাকে মানে নিজেকে হত্যা করতে চাইছেন।

রতিকান্ত: না, জানতো না, কারণ জানলে সে এই কাজ করত না।

মেজ: হুম। কিন্তু শেষে কি এমন হল যে আপনি শেষ মুহূর্তে সরে গেলেন।

বড়: ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন শেষ মুহূর্তে?

রতিকান্ত: ভয়? হ্যাঁ তা হতেও পারে। নাও পারে। শেষ মুহূর্তে আমার মনে হল কেন মরবো? তার চেয়ে লড়ি না কেন? এভাবে পালিয়ে মরার থেকে ওইসব ধান্দাবাজ নোংরা পলিটিক্স-এর লোকগুলোর সঙ্গে লড়াই করতে করতে নয় যুদ্ধক্ষেত্রেই মরবো। আর তাই—

বড়: আর তাই শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে সরে গেলেন?

রতিকান্ত: হ্যাঁ। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কাউকে খুন করিনি বা করতেও চাইনি।

বড়: হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আপনি অন্য কাউকে খুন করতে চাননি। কিন্তু জানেন, আপনি কি করে বসেছেন? ওই মন্দিরের একটা দিক ভেঙ্গে যাওয়ায়, কিছু লোক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লোকালি রায়েট বাঁধানোর তালে ছিল, শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে। আমরা অনেক কষ্টে সেটা সামলাই। অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারত আপনার এই বোকামির জন্য। কপাল ভালো যে

আপনি অক্ষত আছেন।

মেজ: আর তাছাড়া শুধুমাত্র আত্মহত্যার চেষ্টার জন্য আমরা আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারি, এটা কি জানেন?

রতিকান্ত: বিশ্বাস করুন, এত কিছু ভেবে আমি...। আই এম রিয়েলি সরি।

বড়: আপনাকে সব বাধা ঠেলে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে রতিকান্তবাবু। প্রমাণ করতে হবে যে আপনি এখনো ফুরিয়ে যাননি। প্রত্যেককে ইনক্লুডিং আপনার স্ত্রীকেও তার মুখের উপর কড়া জবাব দিতে হবে। পারবেন? পারবেন কি? নাকি জীবনে হেরে গিয়ে ভূত হয়ে সারাজীবন ধরে সরি সারা মরণ কেঁদে কেঁদে বেড়াবেন?

রতিকান্ত: পারব। পারতে আমাকে হবেই।

বড়: নেপোটিজম চিরকাল সর্বস্তরেই আছে এবং থাকবে। তাকে জয় করে বা উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়ার নামই জীবন। এনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন মিস্টার বোস।

মেজ: ইয়েস স্যার। ছট্টিলাল (হাঁক দেন)

ছট্টিলাল: ইয়েস স্যার।

মেজ: এনাকে সম্মানপূর্বক ওনার বাড়ি পৌঁছে দেবেন।

ছট্টি: ঠিক আছে স্যার। চলিয়ে হামারি সাথ।

বড়: জান রতিকান্ত বাবু। আর হ্যাঁ, আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আমায় একটু দিয়ে যান তো। (রতিকান্ত ইতস্তত করে) ভয় নেই কেউ জানবে না। দাদা তার ভাইকে এই সময় যদি একটু কিছু করার চান্স দেয়, আপনি বাধা দেবেন কেন? পরে সময় মত না হয় ফেরত দিয়ে দেবেন। (রতিকান্ত বলে, বড়বাবু লিখে নেন) যান। ভালো থাকবেন।

(একটু মিউজিক)

মেজ: সবইতো হল স্যার। কিন্তু মন্দিরটার কি হবে?

বড়: কেন একজন ঠিকাদার ঠিক করুন। মন্দিরটা সারাতে যা খরচ হয় আমিই দেব।

মেজ: শুধু আপনি দেবেন? আর আমি?

বড়: আপনি?

মেজ: পুলিশ কি শুধু নেয়? দেয় না কিছু সমাজে?

বড়: (অট্টহাসি) হাঃ হাঃ হাঃ মানুষ তো তাই ভাবে মেজবাবু। যাকগে, আপনি যা চাইছেন তাই হবে।

মেজ: ওকে স্যার। আর গোপালের কি করব?

বড়: ওর বিরুদ্ধে আগের কোন কেস পেন্ডিং আছে?

মেজ: না।

বড়: তাহলে চার্জশিটটা এমন ভাবে তৈরি করুন যে গাড়িটা ব্রেক ফেল করাতে, এই কাণ্ড ঘটেছে, বুঝেছেন?

মেজ: ইয়েস স্যার।(মিউজিক)

বিষয়- অ্যালবাম

অনিন্দিতা রায়
অতিথি শিক্ষক, ২০১৯

অনেকদিন হয়ে গেল, আমি পুরোনো অ্যালবাম দেখি না।

আফ্রিকার জুলু উপজাতির মানুষরা তন্নিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করে প্রতি ছবির সঙ্গে আত্মার কিছুটা অংশ অজান্তেই জুড়ে যায়... হয়তো তাই। কিংবা হৃদয়ের মস্তিষ্ক শুধুই যে সুখস্মৃতি রেখে যায়, তাঁরই বুনন ক্রমাগত চারিয়ে যায় ছবিদের মধ্যে। আমি অবাক হয়ে যাই...আমার ছবির চরিত্রদের চিনতে কষ্ট হয়...গ্রীস দেশের থেসাস নগর থেকে সেই যে জাহাজটা এক বিষন্ন সকালে কুয়াশার মধ্যে অজানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল, নিজেকে সেই জাহাজটার মত মনে হয়। বহু পথ ঘুরে বহু জল পেরিয়ে এক অদ্ভুত শীতসন্ধ্যায় সে যখন আবার ফিরে এসেছিল থেসাসের বন্দরে, তখন তাঁকে কেউ চিনতে পারে নি। মাস্তুল বদলেছে। হাল উইয়ে ধরেছে। রং সাদা থেকে ধূসর আর ধূসর থেকে কালো হয়েছে। পোর্টহোলের সোনালী জানালাগুলো খসে গেছে কবে...জাহাজটা টেরও পায়নি এত বছর ধরে এক অনন্ত ধীর প্রক্রিয়া তাঁকে সম্পূর্ণ অন্য জাহাজে পরিনত করেছে...।

অ্যালবাম খুলে সেই ধূসর বা সেপিয়া টোনের ছবিগুলো যেন চেনা চেনা...কোন বিস্মৃত অতীতে আমি এর অংশ ছিলাম। কিন্তু সেই আমি আর আজকের আমিতে বিস্তর প্রভেদ। মানতে চাই না। সব ভুলিয়ে দেওয়া,সর্বরোগহর নস্টালজিয়াতে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাই। বোঝাতে চাই আমি ওটাই...এখন বদলেছি হয়তো। চাইলেই ঠিক আগের মত হয়ে যেতে পারব। কিন্তু বদলে যাওয়ার এই নিত্যতা যে নেহাত রাসায়নিক পরিবর্তন আর সর্বদাই একমুখী তা অস্বীকার করি প্রতি মূহুর্তে...

অ্যালবামের ছবি আমাদের এক কল্পজগতে নিয়ে যায়...সেখানে সবাই খুশি। সবাই ভাল। যে চলে গেছে আর ফিরে আসবে না,সেও কেমন গলা জড়িয়ে হাসছে... যেন চিরটাকাল এইভাবেই কাটবে। ছবি মনে করিয়ে দেয়। কাটে নি। সময়ের নিয়ম মেনেই মানুষগুলো চলে গেছে। সম্পর্কের ইতি ঘটেছে...রয়ে গেছে আমাদের সবার আত্মার কিছু কিছু অংশ। ছবি সেই মৃত আত্মাদের মিউজিয়াম। এ জাদুঘরের অলিতে গলিতে ফেলে আসা সুখেরা ঘুরে বেড়ায়। লম্বা ডোরিয়ান থামের আড়ালে অপেক্ষা করে বিষাদ। অলস ভাবনারা আটপেয়ে বিশাল কালো মাকড়শার মত আবেগের তন্তু দিয়ে জাল বুনে চলে। অদ্ভুত এক বায়োস্কোপের মত যে আমিকে এককালে আমি চিনতাম, তাঁর অনেকদিন আগে ভুলে যাওয়া, মনের গভীরে পুঁতে রাখা স্মৃতির বীজ চারাগাছ হয়ে চোখের সামনে ডালপালা মেলতে থাকে...।

অ্যালবামের শেষ পৃষ্ঠা এলে কালবৈশাখীর ঠিক আগে উড়তে থাকা শুকনো বকুল পাতার মত খড়খড় করে আমার এতদিনের ফুরিয়ে যাওয়া জীবন, কুড়িয়ে নেওয়া জীবনের সঙ্গী সব অপার্থিব চরিত্ররা বাস্তবের তীব্র হাওয়াতে উড়ে যেতে থাকে। হাত বাড়াই। যদি এদের একটা দুটোকে আটকে রাখা যায়...বৃষ্টি নামে। আমার করতল ভেসে যায় সংলাপে সংলাপে। সেই সব সংলাপ, যা এককালে আমার জন্য রচিত হয়েছিল। সেই সব সংলাপ, যা আর শুনতে পাব না কোনদিন। আমি হাত মুঠো করি। তাঁরা আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গলে পড়তে থাকে বিস্মৃতির শ্যাওলামাখা কাদাজমিতে...অজান্তেই চোখের কোনে জল আসে।

আমি অ্যালবাম বন্ধ করি। আমার আত্মার যে অংশ হারিয়েছি চিরদিনের মত,তাঁদেরকে দুই মলাটে বন্দি করে...।

রবীন্দ্র ভাবনায় সত্য, শিব ও সুন্দর

উষাপ্রসন্ন মন্ডল
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক শিল্প চেতনায় ঔপনিষদিক আনন্দ বিরাজমান—'আনন্দাদ্ধ্যের খল্বিমানি ভূতানি জয়ন্তে', বা 'আনন্দরূপম্ অমৃতম যদ্‌বিভাত'। এই ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির বা শিল্প সৃষ্টির মূলে কাজ করে এসেছে, সাহিত্য সৃজনধর্মী, তার প্রকাশ স্বতঃ প্রকাশ তাই তার উদ্দেশ্য থাকে না। সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে যদি কিছু থাকে তবে তা বিশুদ্ধ আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই আনন্দ নানাভাবে এসেছে -' আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'। সৃষ্টি অর্থাৎ সাহিত্য সৃষ্টির মূল অন্তর্নিহিত সত্তা উন্মোচন করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল যে ভাবনাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত দিতে চেয়েছেন তা, 'শিল্প হলো অনুকরণ'। সৃষ্টি সম্বন্ধে এমন ভাবনা রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি সহমত জ্ঞাপন করেননি। তিনি এই তত্ত্বকে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার ভাবনায় সাহিত্য হল সৃষ্টি, শুধু জগতের অনুকরণ নয়— "বাহিরের জগত আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগত হইয়া উঠিতেছে।" (সাহিত্যের তাৎপর্য)। অর্থাৎ সাহিত্য শুধু অনুকরণ নয় তা 'সৃষ্টি'। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সংক্রান্ত রচনাবলী বিশ্লেষণ করে সৃষ্টি, সৃষ্টির মূলে আনন্দকে যেমন বারেবারে পাওয়া গেছে তেমনি এর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে সাহিত্যে সত্য, শিব ও মঙ্গলের কথা।

'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধের রবীন্দ্রনাথের অন্তর্সারিত আনন্দ বোধের জাগরন ঘটেছে সত্য ও সুন্দরের মধ্য দিয়ে— "যে সত্য আমার কাছে নিরতিশয় সত্য তাহাতেই আমার প্রেম, তাহাতেই আমার আনন্দ। এইরূপে বুঝিলে সত্যের অনুভূতি ও সৌন্দর্যের অনুভূতি এক হইয়া দাঁড়ায়"। সৌন্দর্যবোধ যখন সত্যের উপলব্ধি আনে তখনই আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায়। সাহিত্যের মধ্যে আমরা সত্যকেই পাই। আর রবীন্দ্রনাথ সত্যকে দেখেছেন এই ভাবে—''আমাদের মন যে ভাবরাজ্যে বিচরণ করে সেটা দুমুখো পদার্থ— তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আরেকটা দিক হচ্ছে সত্য। যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য, সেই তথ্য যাকে অবলম্বন করে থাকে সেই হচ্ছে সত্য"। (তথ্য ও সত্য)। তথ্য খণ্ডিত আর সত্য অখণ্ড। সাহিত্য সেই তথ্যকে অবলম্বন করে ব্যাপক সত্যের প্রকাশ ঘটায়। 'যব গোধূলি সময় বেলি / ধনি মন্দির বাহির ভেলি'। কথাটি তথ্যমাত্র, কিন্তু এর মধ্যে বিশেষ বালিকার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার তথ্যটি শুধু প্রকাশিত হয়নি, ওই সময়ে তার ঘরের বাহির হবার যে ভিতরকার সত্য এখানে বড় হয়ে উঠেছে এবং ঐ বিশেষ বালিকা নয়, চিরকালের বালিকাদের কথা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য হলো ব্যাপক, পরিপূর্ণ। যে রচনায় সেই খণ্ডকে অবলম্বন করেও অখন্ডের প্রকাশ হয় তা সত্য, সাহিত্যের সামগ্রী।

রবীন্দ্র ভাবনায়,—

"মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ বাহ্য প্রকৃতির তথ্যরাজ্যের সীমা অতিক্রম করে আত্মার চরম সম্বন্ধে নিয়ে যায়, যা সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ; তারই মধ্যে। সেইখানেই মানুষের সৃষ্টির রাজ্য"। (সৃষ্টি)

এই কল্যাণ বোধ হল শ্রেয়োঃবোধ। মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে শ্রেয়োঃবোধ ও প্রেয়ঃবোধ বর্তমান। প্রেয়ঃ অর্থাৎ যা আমাদের আনন্দ দান করে, যা বা যাকে পেয়ে আমরা সুখী হই তা প্রেয়ঃ। আর যার দ্বারা মঙ্গল হয় তাই শ্রেয়ঃ। প্রেয়ঃবোধ আমাদের অন্তরে থাকে এবং প্রেয়োবোধের সঙ্গে আনন্দবোধের অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ বর্তমান। মানুষ অনেক নিষ্ঠুর কাজ করেও আনন্দ পায়, সেখানে শ্রেয়োবোধের অভাব থাকে। কিন্তু সাহিত্যে শ্রেয়োবোধই কাম্য। সাহিত্যের দ্বারা বৃহত্তর মানব সমাজ বা বিশ্বমানবের মঙ্গল বা কল্যাণই সাধিত হয়। কারণ শুধু ব্যক্তিগত প্রেয়োবোধের দ্বারা ব্যক্তিগত সুখ জন্মাতে পারে কিন্তু ব্যক্তিক সুখই সাহিত্যের বিষয় নয়—তা বিশ্বজনীন। তাই শ্রেয়োবোধ বা কল্যাণবোধই সাহিত্যের প্রধান সুর, যে সুরের ঝংকারে উৎসারিত হয় অপার আনন্দ। সাহিত্য সত্যকে প্রকাশ করে। সেই সত্য বাস্তব তথ্য থেকে আলাদা। কারণ, তথ্য খণ্ড, অখণ্ড সত্যের অংশমাত্র। খণ্ড দ্বারা যখন অখণ্ডের বোধ জন্মায় তখনই তা

সত্য হয়। অর্থাৎ সাহিত্যে যে শ্রেয়োবোধ থাকবে তা অবশ্যই মঙ্গলময় হবে। ব্যক্তিগত প্রেয়ঃ বা সুখ নয়, তা থেকে যখন বৃহত্তর মঙ্গলের কথা ব্যক্ত হয় তখন তার সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে ওঠে, যদি কিনা সুন্দরের সহযাত্রী হয়। আসলেই সৌন্দর্যবোধ সাহিত্যের অন্যতম শর্ত। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ভাবনা আনন্দের জাগরণ ঘটায়। এভাবেই সাহিত্য সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনায় এই সত্যের মধ্যে সৌন্দর্যের যে পূর্ণ মূর্তি বিরাজ করছে তার মূলে মঙ্গলদীপের আলোর রশ্মি চিরতরে জাজ্বল্যমান।

এক বেগম আম্মার করুণ কাহিনী: লুৎফুন্নিসা

লিপিকা ঘোষ রায়
অতিথি অধ্যাপিকা
ইতিহাস বিভাগ

জীবনের প্রথমার্ধে সামান্য বাদী হিসাবে জীবন শুরু করে এক সময় সিরাজের প্রিয়তমা পত্নী হিসাবে মর্যাদা লাভ করলেও জীবনের অন্তিমলগ্নে এক নিষ্ঠুর পরিহাসের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এই বেগমকে। লুৎফুন্নিসা বেগম সিরাজের তৃতীয়াস্ত্রী। সৌন্দর্য ও কোমল স্বভাবের জন্য সিরাজ লুৎফুন্নিসার প্রতি আকৃষ্ট হন। এখন প্রশ্ন হল কে এই লুৎফুন্নিসা? লুৎফুন্নিসার প্রকৃত নাম 'রাজকুনওয়ারী', তিনি মূলত বাদী হিসাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন বেগম শরীফুন্নেসার দেখভালের জন্য যিনি কিনা ছিলেন সিরাজের মাতামহী। তখন থেকেই সিরাজের সঙ্গে লুৎফুন্নিসার ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। সিরাজ ক্রমেই লুৎফুন্নিসার সৌন্দর্যের প্রতি মোহিত হয়ে পড়েন। সিরাজের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন বেগম জায়েবুন্নিসা ও দ্বিতীয় স্ত্রী উমদাতুন্নিসা। সিরাজের প্রথম স্ত্রী সর্বদা আমোদ-প্রমোদে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তাদের কোন সন্তানাদি ছিল না। ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতির মধ্য দিয়েও যে সিরাজ ও লুৎফুন্নিসার প্রেম আজও ইতিহাসের পাতায় অমলিন হয়ে আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সিরাজ ও লুৎফুন্নিসার বিবাহ অত্যন্ত জাঁকজমক ও কোটি টাকার ব্যয়ে এই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। তাদের ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন তাদের কন্যা সন্তান জোহরা। কিন্তু লুৎফুন্নিসার জীবনে সুখ বেশিদিন চিরস্থায়ী থাকেনি। অদৃষ্টের অলীক লিখনে লুৎফুন্নিসান জীবন ওলট-পালট হয়ে যায়।

১৭৫৭ সালে মীরজাফরের চক্রান্তে সিরাজ যখন পরাজিত হয়েছিলেন। তিনি তার প্রাণের প্রাসাদ পরিত্যাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন ঠিক সেই সময়ই লুৎফুন্নিসা স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ান। তিনি স্বামীর হাত ধরে প্রাসাদ পরিত্যাগ করেন, সঙ্গে ছিল চার বছরের শিশু কন্যা জোহরা। ভাগ্যের নির্মম খেলা বোধহয় এখান থেকেই শুরু হয় লুৎফুন্নিসার জীবনে। এক ফকির টাকার লোভে সিরাজকে মীরজাফরের ভাই মীর দাউদদের ধরিয়ে দেয় রাজমহল এলাকায়। সিরাজকে সেখানেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পরে মৃতদেহ ঘোড়ার পিঠে বেঁধে সমস্ত জায়গা ঘোরানো হয়েছিল।লুৎফুন্নিসা ও তার শিশুকন্যাকে মুর্শিদাবাদের প্রেরণ করা হয়।

শয়তানের লোলুপ দৃষ্টি লুৎফুন্নিসার উপর পড়তে থাকে। মীরজাফরের ছেলে মীরন লুৎফুন্নিসাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু মহীয়সী নারীরা মনে হয় যুগ যুগ ধরে এই রকম ভাবেই সৃষ্টি হয়। কোনরকম চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না তিনি। তিনি মীরনকে বলেছিলেন তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়েছিলেন। তিনি মোটেও গাধার পিঠে চড়তে রাজি নন। শত কষ্ট শত যন্ত্রণা সম্পূর্ণ মুখ বুজে সহ্য করেছিলেন লুৎফুন্নিসা। মুর্শিদাবাদে তাকে কিছুদিন কারাগারে বন্দি রাখার পর

সেখান থেকে এক নৌকায় চাপিয়ে রাতের অন্ধকারে লুৎফুন্নিসা তার শিশুকন্যা জোহরা, আমিনা বেগম (সিরাজের মাতা), শরীফুন্নেসা(সিরাজের মাতামহী) ঘসেটি বেগম সবাইকে মীরজাফরের নির্দেশে পাঠানো হয় ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে। সেখানে খাবার, থাকার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। অতি কষ্টে বেগমরা জীবন অতিবাহিত করত। টানা সাত বছর জিঞ্জিরা প্রাসাদে আটক করে রাখা হয়। প্রাসাদের মধ্যে বেগমদের উপর চলত অকথ্য নির্যাতন। কখনো তাদের খাবার প্রদান করা হতো আবার কখনো খাবার পানীয় কিছুই দেওয়া হতো না। শোনা যায় বেগমদের গায়ে গরম জল ছুড়ে দেওয়া হতো। প্রাসাদের প্রত্যেকটি ইঁটে বেগমদের কান্না ও গোঙানীর ইতিহাস লেখা থাকবে। আজো এই জিঞ্জিরা প্রাসাদ বাংলাদেশি ভগ্নপ্রায় রূপে দাঁড়িয়ে আছে। দখলদাররা এর বেশির ভাগটাই করায়ত্ত করেছে। ১৭৬৫ সালে জিনজিরা প্রাসাদ থেকে তাকে আর কন্যাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি আবার মুর্শিদাবাদে ফিরে যান। তিনি একটি সংস্থাকে পেনশনের জন্য আবেদন জানান। সরকারপক্ষ কিন্তু পেনশন তাকে প্রদান করেন। সিরাজের ছোট ভাই ইকরাম-উদ-দৌলা ছেলে মুরাদ -উল-দৌলার সাথে জোহরা বেগমকে তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে জামাতা ও পরে ১৭৭৪ সালে জোহরার মৃত্যু হয়। লুৎফুন্নিসার জীবনের সমস্ত কিছু হারিয়ে তার কাছে ছিল শুধু চার নাতনির এক নাতীর অভিভাবকত্ব। তিনি আবারও সংস্থাকে অনুরোধ জানান নাতি-নাতনিদের দেখভালের জন্য টাকা বাড়ানোর। সংস্থাটি নাতি নাতনিদের জন্য ৫০০ টাকা আর লুৎফুন্নিসার জন্য ১০০ টাকা ধার্য করেন।

লুৎফুন্নিসা একমাত্র নবাবের পরিবারের বেগম যিনি সমস্ত ষড়যন্ত্রের উর্ধ্বে থেকে নিজেকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছিল। পলাশীর যুদ্ধে হয়তো তিনি অংশগ্রহণ করেননি, কিন্তু পলাশী তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেনি। জীবনের এক অন্তিম লগ্নে তিনি সিরাজের সমাধির কাছে একটি কুঁড়েঘর নির্মাণ করেছিলেন। সেখানেই বাকি জীবনটা সিরাজের সমাধির পাশেই কাটিয়ে দেন। প্রত্যেকদিন সমাধিতে এসে কোরান শরীফ পাঠ করে সময় অতিবাহিত করতেন। বাকি জীবনটা তিনি এই ভাবেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেই হয়তো পেরেছিলেন এতটা আত্মত্যাগ করতে। কোনরকম লোভ-লালসা তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারেনি। তিনি সিরাজের ভালোবাসায় বেঁচেছিলেন। ১৭৯০ সালে মৃত্যুর পর তাঁর নির্দেশেই খোশবাগ সিরাজের পাশেই তাকে কবরস্থ করা হয়। বিমান থেকে বেগম আম্মা লুৎফুন্নিসা মনে হয় এই ভাবেই জীবন্ত হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

তিনি যা পেনশন পেতেন সেখান থেকে প্রায়ই তিনি কাঙ্গালী ভোজনও করাতেন। বিভিন্ন ধর্মাবেশে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বহু মানুষ আসত। বহু হতাশাগ্রস্ত রোগী তার কাছে দোয়ার জন্য আসতো। হিন্দু মুসলমান সকলের কাছে সম্মানের বেগম আম্মা হয়ে উঠেছিলেন।

স্বপ্ননীড়

সুদেব বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঘরের সন্ধানে ঘরহারা অনিকেত। সেই ছোটবেলায় দার্জিলিং থেকে কলকাতা, তারপর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন। অতসীকে প্রায়ই বলে 'প্রচলিত ছকে অভ্যেসের জীবন আমার পছন্দ নয়'। অতসী জবাব দেয়—'পরিকল্পনা না থাকলে জীবন সমুদ্রে তল পাওয়া যাবে না'। দীর্ঘদিন বাদে আবার দেখা, পরিচালনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল। কলেজ স্কোয়ারে ঝিম মেরে থাকা অনিকেতকে অতসী বলে—'মুখভরা দাড়ি আর ঝোলাতে কতদিন চলবে? ঝুলিতে কিছু উঠলো?' 'Progress' নাটক পড়তে থাকা অতসীকে জবাব দেয়, দেখো অতসী স্রোতের বিপরীতে চালানো আমার স্বভাব, আর এখন নেশা হয়ে উঠেছে। প্রকাশ পেতেই হবে এই ভেবে আমার কলম চলে না। যতদিন আনন্দ পাব ততদিন লিখব। তবে বর্তমানে আনন্দে একটু ভাটা পড়েছে'। '—কেন? এখন আর বোহেমিয়ান যাযাবর বৃত্তি নেই?' '—থাকবে কেমন করে, তোমার সৌজন্যে তেল-নুন-লকড়ি সন্ধানে ব্যস্ত থাকে মন। সবকিছুই বিসদৃশ লাগে। সৌন্দর্য সন্ধানে অপারগ হয় সত্তা'। খানিকটা রেগে গিয়ে অতসী বলে—'আচ্ছা Responsibility বলে তো একটা জিনিস আছে নাকি? এই ভবঘুরে জীবন আর কতদিন? সবার বয়স হচ্ছে'। অনিকেত বলে—'আমি তো তোমাকে বহুবার বলেছি পরিকল্পিত জীবনধারার অযোগ্য আমি। আমি কোনদিনই বোম্বেতে দু'কোটি টাকার 2 BHK কিনতে পারব না। মহানগরীর রাস্তায় Royal Enfield ঘোরাতে পারবো না, পারবো না credit card এ শপিং করতে। তবে হ্যাঁ, স্বপ্নাভিসারী হয়ে মেঠোপথের সুরে জীবনের ধান আর গান শোনাতে পারি'। ম্লান সুরে অতসী বলে—'এসবে আমার কিছু দরকার নেই। ছোট্ট একটা নীড় তো বাঁধতে পারো'। দশটি বসন্ত পরে এমনই বিকেলে মোটা চশমায়, কাঁচাপাকা দাঁড়িতে অনিকেত একলা নদীর তীরে পাঠ করে তার সদ্য প্রকাশিত 'কৃষ্ণচূড়া' কাব্যের কয়েকটি লাইন—

স্বপ্নাভিসারে কৃষ্ণচূড়ার নীচে
তোমার ব্যাগে ভরে দিই মস্ত একটা পৃথিবী
আদরের অনাদরে ক্ষয়ে গেছে সত্তা
তবু, তোমার চোখে দেখি নীড়ের স্বপ্ন।

You and I

Paromita Datta
সহকারী অধ্যাপিকা
ইংরাজী বিভাগ

Call me by any name.
I am everywhere, the OMNIPOTENT all powerful self
I am the ego, the Real and the Shadow
I am the thought, I am the structure, the form and the content.
I am, what you imagine me to be:
Your beauty, your fear, your enemy,
Your friend, the stranger, the familiar neighbor.
I am also what you cannot conceive easily...
Your ideal love, your own child,
Your Vignesh, your Saraswati
Your passion, your latent desires
Your forbidden dreams, your unsatiated hunger.

I reside where you want to be:
In the free-floating clouds,
In the bird's eye-view
In the buzzing drone of bees
And the ripples of the green pond

Feel me in the sweat, in the beat of the heart
In the tear of the eye
Embrace me as you do your dear ones
In the darkest of nights, in the thickness of the blood that flows from your body—
The cyclical blood that restores you your virginity
Remember
You have fought yet another battle and shed blood.
Triumph is yours
Love thyself... I wait to be loved.
My third eye burns with a claim
To see you prosper and live and not yield.

And you may still call me by any NAME
It really would not matter to you or to me or anyone hereafter…